কবরের সওয়াল জওয়াব

খন্দকার আবুল খায়ের

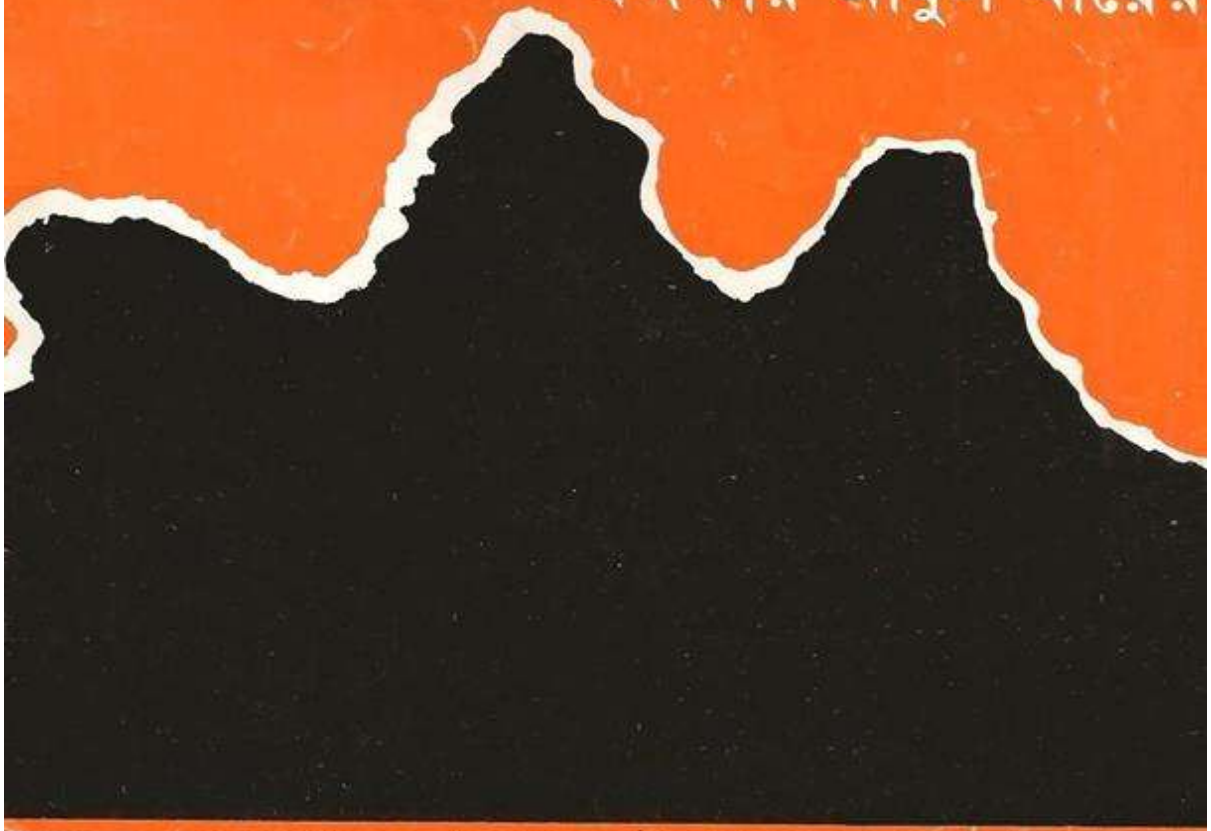

জামেয়া প্রকাশনী ● ঢাকা

কবরের সওয়াল জওয়াব

খন্দকার আবুল খায়ের

আরও ই-বোক সংগ্রহের জন্য,ভিজিট করুন।
http://quransunnahralo.wordpress.com
http://iqraqitab.blogspot.com

শফিউদ্দীন বুক কোম্পানী
কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
পরিবেশক
জামেয়া প্রকাশনী, ঢাকা

সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ
মাওলানা এ, টি, এম, শফিউদ্দীন এম. কম
শফিউদ্দীন বুক কোম্পানী
কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

একাদশ প্রকাশ ঃ
মাঘ, ১৪১৪ বাং
জানুযারী-২০০৮ ইং
মুহাররম ১৪২৯ হিঃ

প্রচ্ছদ ঃ
নিউ ডিজাইন প্যালেস
১৬/১ রমাকান্ত নন্দী লেন
পাটুয়াটুলী, ঢাকা-১১০০।

বর্ণ বিন্যাস ঃ
এম. এন. কম্পিউটার
৪৫, বাংলাবাজার, (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ ঃ
আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিরিশ দাস লেন
ঢাকা-১১০০।

হাদিয়া ঃ ২৫.০০ টাকা মাত্র।

QABARER SOWAL ZOWAB. Questions & Answers in grave: Written by Khondaker Abul Khair (R) in Bangla, Published by Shafiuddin Book Company, Dhaka. Priece : TK. 25.00 Only.

ISBN 984 8192-07-7

ভূমিকা

কবরের সওয়াল জওয়াবের উপর বহু চিন্তা করেছি। চিন্তা করেছি কুরআন হাদিসের জ্ঞানের ভিত্তিতে। এরপর আরো চিন্তা করেছি আলামে-বারযাখ সম্পর্কে। এ ব্যাপারে আমার জ্ঞানে যা ধরা পড়েছে তাই– আল্লাহর উপর ভরসা করে পূর্ণ আস্থা সহকারে লিখে বই আকারে প্রকাশ করা হল। আশা করি পরকালে বিশ্বাসীদের জন্যে এ ছোট্ট বইখানা কাজে লাগতে পারে। এই বিশ্বাস নিয়েই বইটা বাজারে ছাড়া হল। ৫ম সংস্করণে এর সঙ্গে আলামে বারযাখ নামে আরো একটা অংশ ও কয়েকটি হাদিস পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধে যোগ করে দেয়া হল।

আল্লাহই ভাল জানেন এর থেকে পরকালে বিশ্বাসী পাঠক পাঠিকাগণ কতটুকু উপকৃত হতে পারবেন। তবে উপকৃত হতে পারবেন এইটাই আশা করি। ইতি–

–লেখক

প্রকাশকের কথা

খন্দকার আবুল খায়ের নামটি আজ বাংলার ঘরে ঘরে পরিচিত। যারা নামের কাঙ্গাল নন, তাদেরকে আল্লাহ কোন না কোন ভাবে পরিচিত করেই ছাড়েন। মাওলানা যশোরী, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানী, মুফাসসির, বাংলার ক্ষুদে মুজাদ্দিদ– যে যেই বিশেষণেই তাকে জানুক না কেন– আমি তাঁকে ১৯৮০ সন থেকে প্রথম জেনেছি একজন সহজ সরল আল্লাহভীরু আলেমে দ্বীন হিসেবে। তার লেখা 'কবরের সওয়াল জওয়াব' ও অন্যান্য বই পড়ে আমি প্রভাবিত হয়েছি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এ সম্পদ বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছি। ফলে তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাঁর যাবতীয় বই প্রকাশের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি।

প্রতি সংস্করণে প্রতিটি বইয়ের মান বৃদ্ধি পাচ্ছে– এতে কোন কৃতিত্ব থাকলে জামেয়া প্রকাশনীর প্রতিটি নিষ্ঠাবান কর্মীই সে কৃতিত্বের অংশীদার।

লেখক 'কবরের সওয়াল জওয়াব' বইটির স্বত্ত্বাধিকার আমাকে দান করেছেন। তার এ স্নেহের দানকে আমার প্রতি দোয়া ও আশীর্বাদ স্বরূপ মনে করে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করছি।

পাঠকদের কাছে এ বইটি ভাল লাগলে বন্ধুবান্ধবকে পাঠে উদ্বুদ্ধ করতে এবং এতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি পেলে আমাদেরকে জানাতে অনুরোধ করছি।

বিনীত

প্রকাশক

সূচীপাতা

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
মৃত্যু	
১। মৃত্যু কিভাবে হবে	৭
২। নেককার ও বদকার লোকের জানকবজ কিভাবে হবে	৮
৩। নেককার লোকের জানকবজ	৮
৪। বদকার লোকের জানকবজ	৯
৫। কবরের সওয়াল জওয়াব সম্পর্কে ধারণা	১০
৬। কবরের প্রশ্ন মাত্র তিনটি	১২
৭। চিন্তার বিষয়	১২
৮। কুরআন হাদীসের মূল উদ্দেশ্য	১৪
৯। রব শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য	১৬
১০। কবরের দ্বিতীয় প্রশ্ন	১৯
১১। কবরের তৃতীয় প্রশ্ন	২০
১২। সুক্ষ্ম শেরেকী	২১
১৩। মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা	২৪
১৪। আলমে বরযখ	২৭
১৫। পরিশিষ্ট ঃ প্রাসঙ্গিক হাদিস	২৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	
আলমে বারযাখ	
১৬। আলমে বারযাখ	৩৩
১৭। কবরের জীবনই আলমে বারযাখ	৩৩
১৮। আলমে বারযাখ শব্দের অর্থ	৪০
১৯। আমরা কি আলমে বারযাখে গিয়ে দেখেছি যে তা কেমন?	৪২
২০। শহীদদের জন্য আলমে বারযাখ	৪৩
২১। কয়েকটি হাদীস	৪৫

দানপত্র

কবরের সওয়াল জওয়াব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

মৃত্যু

মৃত্যু কিভাবে হবে

কেউ আল্লাহকে বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক মানুষকে মরতে মানুষ দেখে থাকে এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে বেঁচে আছে তারা তাদের জীবনে কেউ না কেউ প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি গিয়ে আবার আল্লাহর মেহেরবাণীতে বেঁচে উঠেছে--এমন লোকের সংখ্যা অবশ্যই কম নয়। কাজেই মৃত্যুর আজাব যে খুবই যন্ত্রণাদায়ক আজাব এতে কোন সন্দেহ নেই তা আমরা কমবেশি প্রায় প্রত্যেকেই বুঝি এবং মানি। আল্লাহর হুকুমে যখন রুহুটাকে চিরদিনের জন্যে বের করে নেয়া হয় তখনকার অবস্থাটা কেমন হবে তা আল্লাহ আল-কুরআনে যেভাবে বলেছেন আসুন আমরা সেই ভাবেই বুঝি। আল্লাহ ৭৯ নং সূরা (আমপারার ২য় সুরা) আন্‌নাযিয়াতের ১নং ও ২নং আয়াতে বলেছেন ঃ

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا * وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا *

১। শপথ সেই (ফেরেশ্‌তার) যে ডুবদিয়ে টানে।

২। এবং খুব সহজ ভাবে বের করে নিয়ে যায়।

ব্যাখ্যাঃ এখানে হযরত আজরাইল (আঃ) এর কথা বলা হচ্ছে তিনি আল্লাহর হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে যার জান কবজ করবেন তার দেহের মধ্যে ডুব দিয়ে তার দেহের প্রতিটি রগ রেশা থেকে তার রুহুকে টেনে বের করে নিয়ে আসেন। মানবদেহের যতখানিতে বোধ আছে তত খানিতে রুহু আছে। সেই রুহু খুব সহজভাবে টেনে বের করে নিয়ে আসাই হচ্ছে আজরাইল (আঃ)এর দায়িত্ব।

দেহের প্রত্যেকটি রগ রেশা, শিরা উপশিরা এবং মাংসপেশী ও মাংসপেশীর প্রত্যেকটি ছোট্ট কোষের মধ্যেও রুহু বিস্তার লাভ করে আছে। সেই সব স্থান থেকে যখন রুহুকে টেনে বের করে আনা হয় তখন সে কাজটা আজরাইল (আঃ) এর জন্য যদিও খুবই সহজ কিন্তু যার জানটা কবজ করা হয় তার জন্যে ঐ মুহূর্তটা অত্যন্ত কষ্টের

মুহূর্ত। রুহুকে প্রতিটি কোষ থেকে টেনে বের করে আনলে অবস্থাটা এরূপ হওয়ার কথা যে যেন একটা প্রাণীর গায়ের চামড়া তুলে নেয়া হচ্ছে এরূপ অবস্থায় ঐ প্রাণীর যেরূপ কষ্ট পাওয়ার কথা তার চাইতেও অনেক গুণ বেশী কষ্ট পাওয়ার কথা যখন দেহের প্রতিটি কোষ থেকে--যা টানা শুরু করা হয় পায়ের ও হাতের নখের গোড়া থেকে শুরু করে মাথার চুলের গোড়া থেকে নিয়ে দেহের প্রতিটি পশমের গোড়া থেকে রুহুকে খেঁচে টেনে বের করে আনা হয়। শেষ পর্যন্ত হার্ট ও মাংসের ক্রিয়া বন্ধ কর দিয়ে পুরা রুহুটাকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের জন্যে বের করে নেয়া হয়। এতে গায়ে যে যন্ত্রণা হয় তা সহজে মুছে যায় না। এ যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পায় মাত্র তারাই যাদেরকে বেহেশ্‌তের ছবি দেখিয়ে বেহেশ্‌ত পাওয়ার জন্যে বেহুশ করে ফেলা হয়। এছাড়া প্রতিটি গোনাগারকেই মৃত্যুর আজাব ভোগ করতেই হবে। এরপর এই যন্ত্রণা থাকতে থাকতেই তাকে কবরে নিয়ে প্রশ্ন করা হবে। যে প্রশ্নের সঠিক জওয়াব দেয়ার উপর নির্ভর করে তার পরবর্তী অন্তকালের জীবন। সে জীবনের নিষ্কৃতি কিসে হবে তা এবার চিন্তা করুন।

নেককার ও বদকার লোকের জান কবজ কিভাবে হবে

নেককার লোকের জান কবজ

বিভিন্ন সহিহ হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় এবং আল কুরআন থেকেও স্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় যে নেক লোকের মৃত্যুর সময় আল্লাহ ফেরেশ্‌তা নাজিল করবেন, তাঁরা এসে বলবে–

اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

(সূরা হামীম আস সাজদা ৩০ নং আয়াত)

নেককার লোকদের মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ ফেরেশ্‌তা পাঠাবেন "ফেরেশ্‌তারা এসে বলবে যে তোমরা ভয় করনা এবং দুঃখিত হয়োনা বা কোন প্রকার চিন্তাও কর না। আর তোমরা সেই বেহেশ্‌তের সু-সংবাদ গ্রহণ করে খুশী হও যে বেহেশ্‌তের ওয়াদা তোমাদের প্রতি করা হয়েছিল।" এইসব নেককার লোকের মৃত্যুর সময় বেহেশ্‌তের ছবি সামনে দেখতে পাবে। ফেরেশ্‌তাগণ তাদের সঙ্গে কথা বলবে।

তাদের সাহস দেবে এবং বলবে যে আমরা দুনিয়াতেও তোমাদের বন্ধু হিসাবে তোমাদের সঙ্গে ছিলাম এবং আখেরাতের জীবনেও তোমাদের সঙ্গে থাকব। তোমাদের কোন ব্যাপারেই দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। এই নেককারদের মৃত্যুটা কেমন হবে তার একটা উদাহরণ হুজুরে পাক (সঃ) এভাবে দিয়েছেন যে কোন একটা খাঁচার পাখীর যদি দরোজা খুলে দেয়া যায় আর ঐ পাখী যদি দেখতে পায় যে তার স্বজাতীয় পাখীরা স্বাধীনভাবে গাছের এ ডাল থেকে ওডালে উড়ে বেড়াচ্ছে আর মনের আনন্দে কিচির মিচির করে ডাকছে বা গান গাচ্ছে তাহলে খাঁচার পাখীর সামনে যতই ভাল ভাল খাবার থাকনা কেন পাখী কোন দিকেই নজর দেবে না। সে যত শীঘ্র পারে, খাঁচা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবেই। ঠিক তেমনইভাবে ঈমানদার লোকের রুহ্ তার দেহ খাঁচা থেকে বের হওয়ার জন্যে ঐরূপই পাগল হয়ে পড়ে। সে আর দেহ খাঁচার মধ্যে কোন প্রকারেই থাকতে চায় না। খাঁচার দরজা যখন আজরাইল (আঃ) খুলে দেন তখন ঈমানদার লোকের রুহ্ সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে আর তার দেহটাকে তখন দেখা যায় যে কোলের শিশু যেন মায়ের কোলে দুধ খেতে খেতে আপছে ঘুমিয়ে পড়ল।

বদকার লোকের জানকবজ ঃ

আর বদকার লোকের মৃত্যুর সময় আজরাইল (আঃ) যখন বদকার লোকের জান কবজ করার জন্যে এসে মাথার কাছে বসবে তখন মৃত্যুমুখী লোকটি আজরাইল (আঃ)কে দেখতে পাবে যে তাঁর কপালে ১২টা চোখ পর পর সাজান রয়েছে। এরূপ চেহারা দেখেই তার ভয়েতে মনটা দারুণভাবে কেঁপে ওঠবে। সে উপরদিকে তাকাতে থাকবে। কথা বলতে পারবে না কিন্তু দেখতে, বুঝতে ও শুনতে পারবে। তারপর ফেরেশ্‌তা বলবে হে বদকার রুহ্ তোর নাপাক জেসেম (শরীর) থেকে বেরিয়ে আয়। এ কথা বলে তার জানকে তার দেহের প্রতিটি কোষ থেকে টেনে বের করে আনা হবে।

বদকার লোকের মৃত্যুর অবস্থা এইরূপ ভাবে রাসূল (সঃ) উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে কোন পাখীকে তার খাঁচার মুখ খুলে বের করে দিতে চাইলে তো পাখীর মনের খুশীতে বেরিয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু যদি খাঁচার দরোজায় একটা শিকারী বিড়াল দাঁড়িয়ে থাকে আর পাখি যদি বোঝে যে আমি খাঁচা থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ঐ শিকারী

বিড়াল ধরে খেয়ে ফেলবে। তাহলে সে পাখী যেমন চায় না খাঁচার দরোজা খুলে দিক তেমন ঐ মৃত্যুমুখী গোনাহগার লোকটিও চাইবে না যে আমার দেহ খাঁচার মুখটা খুলে দিক। শিকারী বিড়াল দেখে যেমন পাখীটা ঐ খাঁচার ভিতরেই পালানোর চেষ্টা করে ঠিক তেমনই বদকার লোকের রুহু তার দেহ খাঁচার ভিতরই পালানোর চেষ্টা করার নিয়ত করে কিন্তু আজরাইল (আঃ) এর পাকড়াও বড় কঠিন পাকড়াও। তার হাত থেকে পালাতে পারবে না কেউই। সে তার মত্যু যন্ত্রণা ভোগ করা পুরাপুরিই ভোগ করবে।

এইভাবেই মানুষের মৃত্যু হয়। এরপর নেককার লোককে আগে দোজখ দেখানো হয় আর বলা হয় "তোমার নেক আমলের কারণে এই দোজখ থেকে রেহাই পেয়ে গেছ"। পরে বেহেশ্‌ত দেখিয়ে বলা হয় এইটাই তোমার চিরস্থায়ী শান্তির বাসস্থান।

আর বদকার লোকদের প্রথমে বেহেশ্‌ত দেখিয়ে বলা হয়, "তোমার বদ আমলের কারণে এই বেহেশ্‌ত তুমি চিরদিনের জন্যে হারিয়েছ"। তার পর দোজখ দেখিয়ে বলা হয় এখানে তোমাকে চিরস্থায়ীভাবে থাকতে হবে। এটা তোমার বদ আমলের প্রতিফল। এখন তার মনে যে অনুশোচনা সৃষ্টি হবে ঐ অনুশোচনাই হবে তার গোর আজাব।

মৃত্যুর পর মানুষের দুটো বড় পরীক্ষা রয়েছে, যথা–

১। বেহেশ্‌ত দোজখ স্বচক্ষে দেখা এবং জেনে নেয়া যে তার শেষ পরিণতি কি রয়েছে তার সামনে।

২। কবরের সওয়াল জওয়াব। এই সওয়াল জওয়াবে যে উতরে যাবে সে প্রত্যেকটি মনজিলেই সহজভাবে পার হয়ে যাবে। এবার আসুন কবরের সওয়াল জওয়াব কি তা বুঝি।

কবরের সওয়াল জওয়াব সম্পর্কে ধারণা

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর বিভিন্ন হাদীস থেকে মৃত ব্যক্তির সাথে কবরে যে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হবে তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে মৃত দেহকে যখন তার আত্মীয় স্বজন দাফন করে চলে আসে তখনই তার রূহকে প্রশ্ন করার সময় হয়। দাফন ছাড়া অন্য কোন ভাবে সৎকার করা হোক বা আদৌ সৎকার না করা হোক মৃতের কাছে সুনির্দিষ্ট সময়ে (যা আল্লাহই ভাল জানেন) মুনকার ও নকীর নামক দুই ফেরেশতা অসামান্য প্রতাপ ও শক্তিমত্তার সাথে কবরে অর্থাৎ মৃতের কাছে হাজির

হবে এবং মৃত ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করবে। কেউ কেউ বলেন মৃত ব্যক্তি দুনিয়ায় যেরূপ জীবিত ছিল, কবরে অনুরূপ জীবন দান করে মৃতদেহের রূহের কাছে মুনকার নকীর প্রশ্ন করবেন। আবার কেউ কেউ বলেন দুনিয়ার মত জীবন দান করা হবে না তবে রূহকে মৃতের বক্ষদেশ পর্যন্ত প্রবেশ করাবে। অতঃপর রূহের কাছে প্রশ্ন করা হবে। কেউ কেউ এ মতও পোষণ করেন যে রূহকে মৃত দেহের মধ্যে প্রবেশ করানো হবে না বরং রূহকে মৃতদেহ ও কাফনের মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হবে। অতপর মুনকার নকীর রূহকে প্রশ্ন করবে। মৃতের অবস্থা যাই হোক না কেন কবর আযাব ও কবরের সওয়াল জওয়াব সম্পর্কে সন্দেহাতীতভাবে প্রত্যেক মুসলমানকে বিশ্বাস করতে হবে। কবর বলতে কোন নির্দিষ্ট স্থান মনে না করে মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী সময়কে বুঝতে হবে।

যা হোক, মুনকার নকীর প্রথমে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার রব বা প্রতিপালক কে? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করবেন, তোমার নবী কে? তৃতীয়বার প্রশ্ন করবেন, তোমার দ্বীন বা জীবনাদর্শ কি? মৃত ব্যক্তি ঈমানদার ও নেককার হলে প্রশ্নের সাথে সাথে জবাব দিয়ে বলবে, আমার রব আল্লাহ যার কোন শরীক নেই। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলবে, আমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" এবং তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে বলবে, আমার দ্বীন আল্লাহ তায়ালার মনোনীত ইসলাম।'

মৃত দেহের রূহ যখন মুনকার ও নকীরের প্রশ্নের জবাব সঠিকভাবে দিবে তখন আল্লাহপাক অনতিদূর থেকে ফিরিশতাদ্বয়কে নির্দেশ দেবেন– "হে ফিরিশ্তাদ্বয়! একে তোমাদের আর কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। আমি এর উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমরা একে নতুন বরের ফুল শয্যার মত কোমল বিছানায় আরামে শুইয়ে রাখ আর এর কবর থেকে বিহিশত পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ করে দাও যেন সে শুয়ে শুয়ে বিহিশতের সুগন্ধি ও আমেজ অনুভব করতে পারে। আল্লাহর আদেশ পাওয়া মাত্র ফিরিশতাদ্বয় তার কবর থেকে বিহিশত পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ করে দেবেন। শেষ বিচারের আগে কেয়ামতের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি সেখানে শুয়ে শুয়ে বিহিশতের শান্তি পেতে থাকবে। অতঃপর ফিরিশতাদ্বয় তার আত্মাকে আল্লাহ পাকের পবিত্র আরশের নীচে নূরের তৈরি এক প্রকার ঝাড়বাতির মধ্যে রেখে দিবে। উক্ত পবিত্র আত্মা সেখানে কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবে।

পক্ষান্তরে মৃতব্যক্তি বেঈমান বদকার হলে মুনকার নকীরের প্রশ্নের জবাবে সে বলবে, "আমি কিছুই জানি না।" তখন ফিরিশতাগণ তাকে প্রচন্ড আঘাত করবে। ফলে চূর্ণ হয়ে তার এক পাশের হাড় অন্য পাশে চলে যাবে। অতঃপর ফিরিশতাগণ আল্লাহ পাকের আদেশ মত উক্ত বদকার ব্যক্তির করব হতে দোযখের দ্বার পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ করে দেবে। পাপী ব্যক্তি তার সংকীর্ণ অন্ধকারময় ভয়াবহ কবর থেকে জাহান্নাম দেখতে থাকবে এবং জাহান্নামের আযাব কিয়ামত পর্যন্ত অনুভব করতে থাকবে।

কবরের প্রশ্ন মাত্র তিনটি
উত্তর ও মাত্র তিনটি বাক্য

প্রশ্ন ঃ مَنْ رَبُّكَ মান রাব্বুকা– (তোমার রব কে?)

উত্তর ঃ আল্লাহ।

প্রশ্ন ঃ مَا دِيْنُكَ মা দ্বীনুকা (তোমার দ্বীন কি?)

উত্তর ঃ ইসলাম।

প্রশ্ন ঃ مَنْ نَبِيُّكَ মান নাবিয়্যুকা– (তোমার নবী কে?)

উত্তর ঃ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

চিন্তার বিষয়

এখন চিন্তার বিষয় হচ্ছে এই যে, কবরের ঐ তিনটি প্রশ্নের উত্তরে যদি ঐ ৩টি বাক্য বলতে পারি, তাহলে গোর আযাবও মা'ফ, দোজখের আযাবও মা'ফ। তাই যদি হয় তবে অন্য কোন নেক আমল না করে যদি শুধু ঐ তিনটি শব্দ খুব ভাল করে মুখস্ত করে রাখি তবে তাতে চলবে কি? যদি তাতে না চলে তবে ঐ তিনটি প্রশ্নের সঙ্গে অবশ্যই সকল প্রকার নেক আমলের সম্পর্ক থাকতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন তিনটি শুনলে তেমন কি কিছু মনে হয় যে, তার সঙ্গে সকল প্রকার নেক আমলের কোন সম্পর্ক আছে? সম্পর্ক তো অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু কিভাবে রয়েছে তা আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়নি। অথচ এটা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা বুঝতে ভুল করলে মানুষ যতই নেক আমল করুক না কেন তার পরকাল চিরতরে বরবাদ হয়ে যাওয়ার

আশংকা রয়েছে। তাই আসুন, প্রশ্ন ৩টি বুঝার চেষ্টা করি। কবরের প্রথম প্রশ্নের সঠিক ব্যাখ্যা পেতে হলে আরও কয়েকটি প্রশ্ন বিবেকের সামনে তুলে ধরতে হবে। যথা–

১। কবরের প্রথম প্রশ্নে যে রবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ হবে সেই রবেরই স্বীকৃতি আল্লাহ কেন নিয়েছিলেন জন্মের পূর্বে 'আলাস্তু বি রাব্বিকুম' প্রশ্নের মাধ্যমে?

২। আল্লাহ যতবার আল কুরআনে মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্কের কথা বলেছেন, ততবারই রব শব্দ দ্বারা বলেছেন এরই বা কারণ কি? যেমন বলা হয়েছে রাব্বুন্নাছ, রাব্বুকা, রাব্বুকি, রাব্বুকুমা, রাব্বুকুম, রাব্বুহুম ইত্যাদি।

৩। রুকু সিজদার তছবিহতে কেন রবের স্বীকৃতি?

৪। ঠিক যে ভাষায় ফেরাউন দাবী করেছিল আমিই 'রাব্বুকুমুল আ'লা, ঠিক সেই একই ভাষায় কেন সিজদার তছবিহতে পড়তে হয় 'সুবহানা রাব্‌বিয়াল আ'লা ?

৫। আল-কুরআনে দুনিয়ার তামাম মানবগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে কেন বলা হল– তোমরা তোমাদের সেই রবের দাসত্ব (এবাদত) কর, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন? এখানে 'কেন আল্লাহর দাসত্ব কর' বলা হল না?

৬। ফেরাউন যখন (মূসা আঃ কে) বলল, আমি তোমার রব, তখন আল্লাহ কেন বললেনঃ হে মূসা (ভুল কর না) নিশ্চয় আমি তোমার রব। কেন এ রব নিয়ে এত টানা হেঁচড়া? রব শব্দকে অবলম্বন করে যদিও আরও বহু প্রশ্ন করা যায়, তবুও বেশী নয় মাত্র এই ছয়টি প্রশ্নের সঠিক জবাব খুঁজে বের করতে পারলেই কবরের প্রথম প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে পারা যাবে। অতঃপর প্রথম প্রশ্নের সঠিক ব্যাখ্যা বের করতে পারলেই পরবর্তী প্রশ্ন দু'টির তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া সহজ হয়ে পড়বে। কারণ পরবর্তী প্রশ্নগুলো হবে প্রথম প্রশ্নের পরিপূরক। কাজেই আসুন, এবার রব শব্দের সঠিক অর্থ আল-কুরআন থেকে উদ্ধার করি। রব শব্দকে একাধিক অর্থবোধকও বলা চলে, আবার ব্যাপক অর্থবোধকও বলা চলে। এই জাতীয় একাধিক ও ব্যাপক অর্থবোধক এমন কিছু শব্দ প্রত্যেক ভাষাতেই রয়েছে, যার কিছু শব্দ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দেয় আর কিছু শব্দ ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন

অর্থ দেয়। যেমন ব্যাকরণ বইয়ের ক্রিয়া শব্দ হচ্ছে ইংরেজির Verb কিন্তু কবিরাজী বইয়ের ক্রিয়া শব্দ Verb এর অর্থ দেবে না, তা দেবে Action শব্দের অর্থ। যেমন আমার মাথা 'ধরেছে' তালগাছে ফল 'ধরেছে' এ দু'ধরা এক নয়, এ ধরেছে শব্দ দু'টিও যেমন দু'টি বাক্যের মধ্যে দু'ধরনের অর্থ দিয়েছে ঠিক তেমনি রব শব্দটিও এক দিকে যেমন বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন ধরনের অর্থ দেয় অপর দিকে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অর্থ দিয়ে থাকে। যেমন সাহিত্যে যেখানে বলা হয়েছে 'রাব্বুদ্দার' সেখানে রব শুধু বাড়ীর কর্তাকে বুঝায়, কিন্তু আল-কুরআন ও আল-হাদীসে রব শব্দ দ্বারা বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী আইনদাতা, হুকুমদাতা, রাজা বাদশাহকে বুঝানো হয়েছে। তাই বলি ক্রিয়া শব্দের সঠিক অর্থ জানতে হয় যে, এটা কি ব্যাকরণের ক্রিয়া নাকি কবিরাজী বইয়ের ক্রিয়া, ঠিক তেমনই রব-এর প্রকৃত অর্থ পেতে হলে জানতে হবে কমপক্ষে দু'টি জিনিস, যথা ঃ

১নং ঃ তা কোন ধরনের গ্রন্থে ব্যবহার করা হয়েছে?

২নং ঃ তা যে বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রকৃতি কেমন।

এবার আসুন প্রথমে দেখি যে গ্রন্থে অর্থাৎ যে কুরআন ও হাদীসে রব শব্দ রয়েছে সে গ্রন্থখানাই বা কেমন এবং 'মান-রাব্বুকা' যে বাক্যের মধ্যে রয়েছে তার প্রকৃতিই বা কেমন। তাহলে অবশ্যই কবরের প্রথম প্রশ্নটির আসল তাৎপর্য উদ্ধার হবে।

এবার প্রথমে দেখা যাক আল-কুরআন ও আল-হাদীস কোন ধরনের গ্রন্থ এবং এ বাক্যের উদ্দেশ্য কি।

কুরআন-হাদীসের মূল উদ্দেশ্য

আপনি যে কোন কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য খুঁজে বের করতে গেলে দেখবেন, তা মাত্র একটাই। যেমন দেখুন রেডিওর মধ্যে যত প্রকার যন্ত্রপাতি রয়েছে, তার মূল উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হচ্ছে দূরের শব্দ ধরা। ঠিক তেমনই একখানা প্লেনের ইঞ্জিনের মধ্যে যত প্রকার যন্ত্রপাতি রয়েছে, সেগুলির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধুমাত্র প্লেনকে নিরাপদে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। ঠিক তদ্রূপই ইসলামের যাবতীয় আইন-কানুন বলুন আর কুরআন-হাদীসই বলুন সবগুলির একটাই মাত্র উদ্দেশ্য আর তা হচ্ছে,

মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসে পরিণত করা। যেন সে আল্লাহর দাসত্ব করার পথ ধরে ইহকালেও শান্তি পেতে পারে পরকালেও মুক্তি পেতে পারে। আর এতে যদি মানুষ ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ মানুষ যদি মানব রচিত আইনের চাপে পড়ে আল্লাহর যাবতীয় হুকুম আহকাম মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তবে সে যেমন ইহকালেও হবে লাঞ্ছিত, হেয়, পদদলিত, তেমন পরকালেও ভোগ করবে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (বলছেন আল্লাহ)।

এ আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, মানুষকে হতে হবে একামত্র আল্লাহরই দাস, আর তা হতে পারলেই মুক্তি। কাজেই মৃত্যুর পর তাকে কবরে যা প্রশ্ন করা হবে, তার ভাষা যাই হোক না কেন, তার প্রকৃত অর্থ অবশ্যই এমন হতে হবে যে, সে সারা জীবন আল্লাহর হুকুমের ফরমাবরদার বা দাস ছিল কিনা। প্রকৃতপক্ষে কবরের ঐ তিনটি প্রশ্নের মাধ্যমে তা'ই জিজ্ঞেস করা হবে যে সেকি কাটায় কাটায় আল্লাহর দাস থাকতে পেরেছিল? কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এইখানে যে, আমাদেরকে তা বুঝানো হয়নি। অর্থাৎ বুঝানো হয়নি যে, ঐ ৩টি প্রশ্নের মধ্যে নিহিত রয়েছে নামায, রোযা থেকে শুরু করে ইসলামী আন্দোলন, জামাতবদ্ধভাবে সংগ্রাম বা জিহাদ, হিজরাত, খিলাফত কায়েম ইত্যাদি সব কিছুরই জিজ্ঞাসা। বরং উল্টা বুঝিয়ে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে নামায, রোযা করলে প্রশ্ন ৩টির উত্তর আল্লাহ মনে করিয়ে দিবেন। নইলে মনেই হবে না যে, কোন প্রশ্নের উত্তরে কি বলতে হবে। এই হচ্ছে একটা সাংঘাতিক আত্মঘাতি বুঝ। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে প্রত্যেক মুর্দারই কবরের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর কি তাও সে বুঝতে পারবে এবং আল্লাহ, ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (স)-এ কথা ক'টাও তার মনে থাকবে কিন্তু সে বলবে না। এটা কেমন ব্যাপার হবে, তা বুঝানোর জন্যে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন ধরুন, কারও পিতা তাকে দশটি টাকা দিয়ে বললেন, যাও বাজার থেকে দশ টাকার চাউল কিনে আন। কিন্তু সে ছেলেটি চাউল কিনতে বাজারে না গিয়ে অন্যের প্ররোচনায় সিনেমা দেখতে গেল, তারপর বাড়ী ফিরলে তাকে যদি তার মা ৩টি প্রশ্ন করেন। যথা–

১। তুই কোথায় গিয়েছিলি?

২। কে যেতে বলেছিল?

৩। গিয়ে কি এনেছিস?

এর উত্তরে তাকে তো বলার দরকার ছিল ঃ

১। বাজারে গিয়েছিলাম।

২। আব্বা যেতে বলেছিলেন।

৩। বাজার থেকে চাউল এনেছি।

কিন্তু সে ছেলে যদি কারও খপ্পরে পড়ে ঐ টাকা ক'টা নিয়ে কোন অহেতুক কাজে ব্যয় করে খালি হাতে বাড়ী ফেরে, আর তার মা যদি তাকে উপরোল্লিখিত প্রশ্ন ৩টি জিজ্ঞেস করে, তাহলে সে কি তখন 'বাজার' 'আব্বা' ও 'চাউল' কথা ৩টি ভুলে যায়? তা অবশ্যই ভুলে না। কিন্তু তবুও কেন বলে না? বলে না এই জন্যে যে, সেতো পিতার হুকুম মানেনি, কাজেই মিথ্যা বললে তো মা ছাড়বেন না, আব্বাও ছাড়বেন না। ঠিক তদ্রুপ মানুষ যখন কবরের প্রশ্নের সম্মুখীন হবে, তখন সে ব্যক্তি প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য ও তার প্রকৃতি কেমন তা বুঝবে। কাজেই 'আল্লাহ', 'ইসলাম' ও 'হযরত মুহাম্মদ (স)' কথা কয়টা মনে থাকা সত্বেও বলবে না। বলবে না এই জন্যে যে, তা বললে মিথ্যা বলা হবে। এইবার লক্ষ্য করুন, পর্যায়ক্রমে রব, দ্বীন ও নবীর প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা আলোচনা করছি।

রব শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য

বাংলা ভাষায় এমন একটি শব্দও খুঁজে পাওয়া যায় না, যাতে রব শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝায়। তাই রব শব্দ দ্বারা আল্লাহ যা বুঝিয়েছেন তাই সংক্ষেপে এখানে বলছি।

যার পূর্বে কোন অস্তিত্ব ছিল না, তাকে যিনি অস্তিত্ব দিয়েছেন, তিনিই হচ্ছেন তার 'রব'। এই অর্থে আল্লাহ সবকিছুরই রব। তাই বলা হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন। এর পর অস্তিত্ব দানের সঙ্গে আর যে ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক রয়েছে, তা যিনি করেন তাঁকেও বলা হয় রব। অর্থাৎ কোন কিছুর অস্তিত্ব দান করলে তাকে যথাক্রমে–

১। পূর্ণতা দান করা।

২। টিকিয়ে রাখা।

৩। লালন-পালন করা।

৪। পর্যবেক্ষণ করা।

৫। তার গতিপথ নির্দেশ করা।

৬। আইন-কানুন দান করা।

৭। তাদের উপর প্রভুত্ব করা।

৮। যেগুলি প্রাণী—তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা।

৯। যেগুলি যেমন বস্তু তার টিকে থাকার তেমন ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সবকিছু যিনি করেন, তাকেই এক কথায় বলা হয় রব। অর্থাৎ উপরোল্লিখিত সবগুলি গুণবিশিষ্ট একক সত্তাকে আল-কুরআন ও আল-হাদীসে এক কথায় বলা হয়েছে রব। কাজেই যেহেতু আল্লাহই মানুষের আইনদাতা ও রাজাধিরাজ, তাই মানুষের বাদশাহ বুঝানোর জন্যেও আল-কুরআনে রব শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে বুঝা গেল, মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই মানুষের সামগ্রিক জীবন-যাপন হবে কোন পথে বা কোন আইন অনুযায়ী, তা (সে আইন) তিনিই তৈরী করে দিয়েছেন। এ কারণেই মানুষের আইনদাতা, হুকুমকর্তা বাদশাহ বুঝানোর জন্যেও আল্লাহকে রব বলা হয়। কিন্তু কোন মানুষ যদি মানুষের বাদশাহ হয়ে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজ তৈরী আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, তবে তিনি মানুষের রবের ন্যায়ই কাজ করেন, তাই আল-কুরআনে সেই সব বাদশাহদেরকে রবের দাবীদার বলেই ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন সূরা ইউসূফের মধ্যে (আল্লাহ্‌র ভাষায়) ইউসূফ (আ) বলেন, "ফা-ইয়াসকি রাব্বাহ্‌ খামরান"। "অতপর সেই তার রবকে মদ পান করাবে।" এখানে রব শব্দ দ্বারা মিসরের সেই বাদশাহকেই বুঝানো হয়েছে, যিনি নিজতৈরী আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। আর মিসরের জনগণও তাকে তাদের রব বলেই মানতো। তাহলে উপরোক্ত আয়াত শরীফ থেকে স্পষ্ট দলীল পাওয়া গেল যে, যিনিই আইনদাতা বাদশাহ তিনিই হচ্ছেন রব।

আমরা সাধারণত মনে করি, আমি যদি ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত মেনে চলি তাহলে কেউই আমাদের বাধা দেয় না। আমি বহু বড় বড় জনসভায় লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেছি যে আপনারা কি মনে করেন আল্লাহ্‌র আইন মেনে চলতে আপনাদের বাধা আছে? সবাই জবাবে বলেছেন "না বাধা নেই"। অতঃপর আমি পুণরায় জিজ্ঞেস করেছি, আপনারা বলেছেন আল্লাহর আইন মেনে নিতে 'কোন বাধা নেই' তাই যদি হয় তবে পারবেন কি খোদায়ী বিধান মুতাবিক চোরের হাত

কাটতে, ব্যভিচারীকে রজম[১] করতে? বেশী নয়, পারবেন কি খোদায়ী বিধান মুতাবিক একখানা গাড়ী নিয়ে রাস্তার ডান পাশ দিয়ে চলতে? এ সব প্রশ্নের জবাবে প্রত্যেকেই বলেছেন, না রাষ্ট্রীয় বিধান অমান্য করে ঐ সব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আইন মেনে চলা যাবে না। অতঃপর তারা স্বীকার করেছেন যে, আমাদের পূর্ব ধারণা যে ভুল তা প্রমাণিত হল। অর্থাৎ সরকার যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন মেনে চলতে বাধার সৃষ্টি করে, সেই সব ক্ষেত্রে যে কোন জাদরেল সূফীও সরকারী আইন উপেক্ষা করে আল্লাহর আইন মেনে চলতে পারেন না।

তাহলে বুঝা গেল, মানুষ তখনই আল্লাহর যাবতীয় আইন সামগ্রিক জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে মেনে চলতে পারবে, যখনই আল্লাহর আইন রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হবে, অর্থাৎ যেটাই আল্লাহর আইন সেটাই যদি হয় রাষ্ট্রের আইন, তবে মানুষ বাধ্য হয়েই রাষ্ট্রের আইন মানে, আর তাতেই তার আল্লাহর আইন মানা হয়ে যায়। এ ছাড়া সরকারী আইন যদি আল্লাহর আইনের বিপরীত হয়--যেমন, রাষ্ট্রের আইন রাস্তার বাম পাশ দিয়ে গাড়ী চালাও, আল্লাহর বিধান যার যার ডান পাশ দিয়ে পথ চল--তাহলে রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করে কেউই রাস্তার ডান পাশ দিয়ে চলতে পারে না। অথচ আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে এই যে, কোন ক্ষেত্রেই মানুষ যেন মানুষের আইন না মানে, তাহলেই সে পরকালে পরিত্রাণ পাবে; নইলে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন পথ নেই। এটাই হচ্ছে প্রকৃত ব্যাপার। তাই কবরে মানুষকে বেশী প্রশ্ন না করে সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করা হবে যে তুমি রব হিসেবে মেনে এসেছ কাকে? যদি রব হিসেবে অর্থাৎ আইনদাতা, হুকুমকর্তা, রাজা, বাদশাহ হিসেবে মানুষকে মেনে এসে থাক, তাহলে তো অবশ্যই আল্লাহর সব আইন মানতে পারনি। পেরেছ মাত্র ততটুকু মানতে যা মানতে তোমাদের মানুষ-রব বাধা দেয়নি। এতটুকু সহজ সরল বুঝও আমাদের অনেকের মগজে ধরে না। অনেকে খুব পাকা ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও কম বুঝের কারণে এমন কিছু ইসলাম বিরোধী যুক্তি মেনে নিয়েছেন এবং তা দ্বীনের খাতিরে নেক নিয়তে প্রচার করেন, যার ভিতরকার আসল চেহারাটা যে কি, তা তারা চিন্তা করেন না। তারা এমন কিছু কথা বলেন, যা বলে তারা ইসলামী খিলাফত কায়েমের

১. *'রজম' অর্থ যিনা বা ব্যাভিচারের অপরাধীকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুতে কোমর হতে উপর দিকের অঙ্গগুলিতে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা দণ্ড দেয়া।*

বরোধিতা করেন এবং এ বিরোধিতা করে তারা মনে মনে তৃপ্তি লাভ করেন এবং মনে করেন এ বিরোধিতায় আল্লাহ তাদের উপর খুশি হয়ে তার বিনিময়ে তাদেরকে বেহিসাব বেহেশত দান করবেন। তাদের সে কথাটা হচ্ছে এই যে--

১। আগে ভাগে ইসলামী হুকুমত কায়েম করলে মুসলমানদেরকে আরও গোন্যহগার করা হবে, অর্থাৎ যাদের মধ্যে এখনও ঈমান আসেনি ইসলামী রাষ্ট্র হলে তাদেরকে জোর করে নামায পড়ানো হবে, তখন তারা বিনা ওজুতে নামায পড়ে নামায না পড়ার চাইতে আরও বেশী গুনাহ্গার হয়ে পড়বে।

প্রকৃতপক্ষে এটা একটা বিভ্রান্তিকর আকীদা। এ কথা যারা বলেন, তাদের নিকট আমি উল্টো জিজ্ঞেস করব যে, ঈমানের পূর্বে ইসলামী হুকুমত কায়েম হলে আপনার তো ভয় যে, মানুষ বিনা ওজুতে নামায পড়বে। কিন্তু বিনা ওজুতে তারা আরও কিছু কাজও তো করবে, যেমন বিনা ওজুতে পর্দা করবে, বিনা ওজুতে চুরি করলে হাত কাটবে, বিনা ওজুতে দোর্রা মারবে, বিনা ওজুতে সুদ-ঘুষ উঠে যাবে, বিনা ওজুতে আইনের মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার দেয়া হবে; বিনা ওজুতে মানুষ যার যার মৌলিক অধিকার ভোগ করবে, এতেও কি গোনাহে কবীরা হবে? এর কি জবাব দিবেন?

কবরের দ্বিতীয় প্রশ্ন

কবরের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি দ্বীন হিসেবে কোন্টা মেনে এসেছে। এ প্রশ্নটার সঠিক ব্যাখ্যা পেতে হলে দেখতে হবে কমপক্ষে দু'টো জিনিস, যথা ঃ

(১) দ্বীন কোন্ কোন্ অর্থে আল-কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

(২) তার কোন্ অর্থটা গ্রহণ করলে তা প্রথম প্রশ্নের পরিপূরক বা সম্পূরক হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সেই অর্থটাই এখানে গ্রহণ করতে হবে।

আল-কুরআনে দ্বীন মোটামুটি ৪ প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যথাঃ

(ক) ধর্ম

(খ) কর্মফল

(গ) জীবন-ব্যবস্থা
(ঘ) রাষ্টীয় সংবিধান।

সূরা ইউসূফের মধ্যে যেখানে বলা হয়েছে "ফি দ্বীনিল মালিক" সেখানে দ্বীন মানে রাষ্ট্রীয় বিধান। অবশ্য আমরা জীবন–ব্যবস্থা নামে যে শব্দটা ব্যবহার করি, তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যা আমরা অনেকেই খেয়াল করি না, অর্থাৎ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যে জীবন-ব্যবস্থার মধ্যেই অবস্থান করে, তা চিন্তা করে খুব কম লোকে। তাই 'দ্বীনের' অর্থ যখনই রাষ্ট্রীয় সংবিধান বলা হয়, তখন অনেকের নিকট তা নতুন বলে মনে হয়, কিন্তু খোদ আল্লাহই রাষ্ট্রীয় সংবিধান বুঝাতে গিয়ে দ্বীন শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা কেউ ভেবে দেখি বলে মনে হয় না।

প্রকৃতপক্ষে কবরের দ্বিতীয় প্রশ্নের মধ্যে দ্বীন নামে যে শব্দটা রয়েছে, তার যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ হবে রাষ্ট্রীয় সংবিধান। অর্থাৎ 'মা দীনুকা' এর অর্থ হবে তোমার রাষ্ট্রীয় সংবিধান কি ছিল? তা কি মানুষের তৈরী ছিল, নাকি আল্লাহর দেয়া 'ইসলাম' ছিল বা আল-কুরআন ছিল? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হলে আজ বেচেঁ থাকতেই মানতে হবে যে, আল-কুরআনই আমাদের একমাত্র সংবিধান।

কবরের তৃতীয় প্রশ্ন

'মান্ নাবীয়্যুকা' হচ্ছে তৃতীয় প্রশ্ন। তোমার নবী কে ছিলেন? এর অর্থ হল তোমার জাতীয় নেতা কে ছিলেন, তুমি আদর্শ হিসেবে কাকে গ্রহণ করেছিলে এবং যে জীবন– ব্যবস্থা জীবনে গ্রহণ করেছিলে তা কার আকীদা বিশ্বাস অনুযায়ী ছিল।

এই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কবরের প্রশ্নগুলির তাৎপর্য। এবার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লক্ষ্য করুন, এ সম্পর্কে খোদ আল্লাহই বা কি বলেন এবং তার রাসূলই বা কি বলেন ঃ

আল্লাহ বলেন–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلَايُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا*

"ফামান কানা ইয়ারজু লিকায়া রাব্বিহি ফাল ইয়ামাল আমালান সালিহাওঁ ওয়ালা ইয়োশরিক বিইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা" অর্থাৎ যারাই তার প্রকৃত বাদশার সামনে পরকালে হাজির হওয়ায় বা সাক্ষাৎ করায় বিশ্বাস রাখে, তারা যেন সৎকর্মশীল হয় এবং তাদের বাদশাহ (আল্লাহর) আনুগত্য ও দাসত্ব করতে গিয়ে যেন অন্য কোন বাদশার আনুগত্য ও দাসত্ব করে তাকে আল্লাহর শরীক করে না বসে।

(আল-কাহাফ ঃ ১১০)

এ আয়াত শরীফে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যারাই আল্লাহর পরিবর্তে কোন মানুষ বাদশার আনুগত্য ও দাসত্ব করবে, তারাই প্রকৃত মুশরিক। আর এই শেরেকীর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়াটাই মানুষের জন্যে ভীষণ কষ্টকর। অথচ আল্লাহর পরিষ্কার ঘোষণা হচ্ছে এই যে–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ –

(আন্-নিসা ঃ ৪৮)

"ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু, আঁইয়ুশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দূনা জালিকা লিমাইঁ ইয়াশাউ।" অর্থাৎ আল্লাহ শেরেকীর গোনাহ অবশ্যই ক্ষমা করবেন না, এ ছাড়া অন্যান্য গোনাহ আল্লাহ যাকে খুশি ক্ষমা করবেন। এই শেরেকী গোনাহ সম্পর্কে আল্লাহ আরও বলেছেন––

লোকমান ঃ ১৩– إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ "ইন্নাশ্‌শিরকা লাজুলমুন আজীম"। অবশ্যই শেরেকী মস্তবড় জুলুম। যা ক্ষমার অযোগ্য। অথচ এ শেরেকী সম্পর্কে এ যুগের বহু মুসলমানেরই ধারণা অস্পষ্ট। এমনকি রবের ব্যাপারে অন্য কাউকে শরীক করার গোনাহকে বহু খোদাভক্ত লোকই ভুলবশতঃ গোনাহই মনে করেন না।

সুক্ষ্ম শেরেকী

শেরেকী দুই প্রকার। যথা–– (১) শিরকে জলি বা প্রকাশ্য শেরেক যেমন প্রতিমার পূজা, চাঁদ সূর্যের পূজা ইত্যাদি। এই জাতীয় শেরেকী মুসলমানদের মধ্যে নেই। (২) শিরকে খফি বা গোপন শেরেকী, এটাকেই বলেছি সূক্ষ্ম শেরেকী। এটা হচ্ছে আল্লাহর কোন গুণের সঙ্গে কাউকে শরীক করা। এই শেরেকী ঈমানদার লোকেও করে। তাই

আল্লাহ বলেন– وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ *

"অমা ইউমিনু আকছারুহুম বিল্লাহি ইল্লা ওয়াহুম মুশরিকুন"।

অর্থাৎ এমন বহু ঈমানদার রয়েছে যাদের অধিকাংশ মুশরিক। –ইউছুফ ঃ ১০৬। এই শেরেকী মুসলমানরাই করে। এটাই হচ্ছে জ্ঞানের অগোচরে শেরেকী। যেমন বহু নামাযী রয়েছেন যারা মানুষকে রব হিসেবে মেনে যাচ্ছেন কিন্তু তা তারা টেরই পাচ্ছেন না। এই মানুষ রবের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে প্রয়োজন খোদায়ী খিলাফত কায়েম করা। এছাড়া কোন প্রকারেই মানুষ রবের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন বিকল্প পথ নেই। এই জন্যেই আল্লাহর প্রত্যেক নবীরই কাজ ছিল ইসলামী হুকুমত কায়েম করা। এই কাজেরই হুকুম আল্লাহ দিয়েছেন ঃ اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَاتَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط "আন আক্বিমুদ্দীনা ওয়ালা তাতাফার্‌রাকূ ফিহি অর্থাৎ আল্লাহর রাষ্ট্র কায়েম কর, এ কাজে কেউই কোন মতবিরোধ করোনা।" (আশ্‌–শূরা ঃ ১৩) এই আয়াতের মাধ্যমে। আর এ কাজ করতে পারলেই আল্লাহ বলেন. يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط "ইয়াবুদুনানি লা ইয়োশরিকূনা বি শাইয়ান" অর্থাৎ আমার ইবাদত করতে পারবে এবং আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করতে হবে না। (আন্‌-নূর ঃ ৫৫) আসুন এই শেরেকীর হাত থেকে আমরা সবাই বাঁচার চেষ্টা করি।

এবার দেখুন রাসূল (স) কি বলেন–

কবরের তিনটি প্রশ্নকে বুঝার জন্যে নিম্নের একটি হাদীসই যথেষ্ট। হুজুর (স) বলেছেন, তোমরা বল––

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا–

"রাদিতু বিল্লাহি রাব্বাওঁ ওয়াবিল ইসলামে দীনাও ওয়াবি মুহাম্মাদিন নাবীয়ান" অর্থাৎ আমি এতেই রাজি হয়েছি যে, আল্লাহ আমার রব, ইসলাম আমার দ্বীন এবং হযরত মুহাম্মদ (স) আমার নবী। এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে আমি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে রব বলে মানতে রাজী নই, তা সে নমরূদ বা ফেরাউন নামেরই কেউ হোক, অথবা অন্য যে কোন নামের যে কোন ব্যক্তিই হোক না কেন, আমি কাউকেই রব বা আইনদাতা হুকুমকর্তা বাদশাহ হিসাবে মেনে নিতে রাজি নই। আর দ্বীন বা রাষ্ট্রীয় সংবিধান হিসেবে একমাত্র ইসলামের দেয়া

সংবিধান আল-কুরআন ছাড়া অন্য যে কোন রাষ্ট্রীয় সংবিধান আমি মানতে রাজি নই। তা সে সংবিধান মক্কা মদীনার মানুষেরই তৈরী হোক, কিংবা যে কোন দেশের যে কোন মানুষের তৈরী হোক না কেন, আমি তার কোনটাই মানতে রাজি নই। আমি শুধু মানতে রাজি আল্লাহর (আরশে মুয়াল্লার) তৈরী সংবিধান। আর নবী হিসেবে অর্থাৎ উসওয়াতুন হাসানা বা উত্তম আদর্শ, ইমামুল মুত্তাকীন বা মুত্তাকীনদের জাতীয় নেতা এবং রাসূল রাব্বিল আ'লামীন হিসেবে হযরত মুহাম্মদ(স)কেই মানতে রাজি এবং তাতেই আমি খুশী। তা ছাড়া আর কাউকে জাতীয় নেতা হিসেবে মানতে রাজী নই।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, কবরের ঐ প্রশ্নের ৩টি কথাই আমি মানতে রাজি এ কথা আমাদেরকে দিয়ে বলানোর মধ্যে রাসূলের কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল? সে উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে শুধু মাত্র ঐ ৩টি ব্যাপারেই দেশের শাসক গোষ্ঠী আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত অন্য কিছু মানতে জনগণকে বাধ্য করে।

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রব হিসেবে, আল-কুরআন বা ইসলামী আইনের পরিবর্তে মানুষের তৈরী আইনকে রাষ্ট্রীয় সংবিধান হিসেবে এবং কমপক্ষে দেশের জাতীয় নেতা হিসেবে রাসূলের পরিবর্তে অন্য কাউকে নেতা স্বীকার করতে চাপ সৃষ্টি করেও বাধ্য করে কিন্তু মানুষ যদি সেই চাপে বাধ্য হয়ে মানুষকেই রব আর মানুষের তৈরী আইনকেই দ্বীন এবং অ-নবীকেই জাতীয় নেতা হিসেবে মেনে নেয়, তবে সে অবশ্যই কবরের প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না। ফলে তাকে অনন্তকালের জীবনে বাস করতে হবে আগুনের মধ্যে। এই কারণেই রাসূল (স) হুঁশিয়ার করে দিলেন যে, খবরদার! দুনিয়ার কোন মানুষকে রব বা আইনদাতা বাদশাহ হিসেবে মানতে রাজী হয়ো না। আর রাষ্ট্রীয় সংবিধান হিসেবে মানুষের তৈরী আইন মানতেও রাজী হয়ো না এবং জাতীয় নেতা হিসেবেও আমাকে (রাসূলকে) ছাড়া অন্য কাউকে মানতে রাজি হয়ো না।

দুর্ভাগ্য আমাদের এখানে যে ইংরেজরা আমাদের উপর প্রভু হয়ে যে দু'শো বছর আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল, সেই সময়ে তারা সুপরিকল্পিত ভাবে আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে এমন ভাবে বিভ্রান্ত করেছে যে, কবরের প্রশ্ন ৩টিকেও বুঝার সুযোগ দেয়নি ও মন মস্তিষ্কও

নষ্ট করে দিয়েছে, যার জন্যে আমার এ ব্যাখ্যা অনেকের নিকটই নতুন বলে মনে হবে, যদিও এর একটি কথাও নতুন নয়।

তাহলে প্রমাণ হল, কবরের ৩টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে ইসলামী সংগঠন ও ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রগঠন করতেই হবে। যেন--

(১) আল্লাহকেই রব বলে মানা যায়,

(২) আল-কুরআনকেই রাষ্ট্রীয় সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা যায় এবং

(৩) রাসূলুল্লাহ (স) কেই আদর্শ জাতীয় নেতা ও রাসূল হিসেবে মানতে পারা যায়।

আশা করি, এ অকাট্য সত্য বুঝতে আমরা সক্ষম হবো।

মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা

মানুষের মধ্যে দু'টো জিনিস রয়েছে।

(১) দেহ–যা দেখা যায়। (২) রূহ–যা দেখা যায় না।

দেহকে কেটে তন্য তন্য করে দেখলেও তার মধ্যে এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা দেখতে পাওয়া যায় না। যেমন মানুষের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, মন--যে মনের মধ্যে রয়েছে ভালবাসা, রাগ, হিংসা, দ্বেষ, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক বিবেচনাবোধ ইত্যাদি সবই আছে মানুষের মধ্যে কিন্তু তা দেখা যায় না। যা-ই দেখা যায় না তারই সম্পর্ক হচ্ছে রূহের সঙ্গে। আর রক্ত, মাংস, হাড়, রগ, স্নায়ূ, পাকস্থলি, কলিজা ইত্যাদি যা দেখা যায় তার সম্পর্ক হচ্ছে দেহের সঙ্গে।

মানুষ মরে গেলে যেগুলোর সম্পর্ক দেহের সঙ্গে তার কিছুই থাকবে না। আর যেগুলোর সম্পর্ক রূহের সঙ্গে তার সবই থাকবে। অর্থাৎ বস্তুর তৈরী কান যা দেখা যায় তা থাকবে না কিন্তু শ্রবণশক্তি যা দেখা যায় না তা থাকবে। ঠিক তেমনই বস্তুর তৈরী মাথা যা দেখা যায় তা থাকবে না কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি যা দেখা যায় না--তার সম্পর্ক যেহেতু রূহের সঙ্গে--তাই থাকবে। ঠিক তেমনই চোখ থাকবে না কিন্তু দৃষ্টি শক্তি থাকবে। মানুষ মনে করে চোখই দেখার মালিক আর কানই শোনার মালিক, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে শ্রবণ শক্তির মাধ্যম হচ্ছে কান আর

দৃষ্টি শক্তির মাধ্যম হচ্ছে চোখ। যেমন কেউ যদি ঘুমিয়ে থাকে আর সেখানে তার কানের কাছে বসে কেউ কোন গল্প বলে আর সেই ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগলে যদি তাকে প্রশ্ন করা যায় যে বলতো আমি কি গল্প বলেছি? সে বলবে আমি কিছুই শুনিনি। কিন্তু কেন শোনেনি তার কানের কাছে বসেই তো বলেছে?

ঠিক তদ্রুপ যদি কারো ঘুমন্ত অবস্থায় তার চোখটাকে একটু ফাঁক করে ধরে তার চোখের সামনে কোন কিছু ধরি আর ঘুম থেকে জাগার পরে যদি তাকে জিজ্ঞেস করি যে বলতো তোমার চোখের সামনে কি ধরেছিলাম তাহ'লে সে তা বলতে পারবে না। কেন পারবে না? পারবে না এই কারণে যে, তার ঘুমন্ত অবস্থায় তার দৃষ্টি শক্তি তার শ্রবণ শক্তি চোখ এবং কান মাধ্যমগুলি থেকে সাময়িক ভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল। এই জন্যই সে কোন কথা শোনেনি এবং কোন কিছু চোখের সামনে ধরলেও সে তা দেখেনি। কারণ শোনার মূল মালিক শ্রবণশক্তি কিন্তু শোনার মাধ্যম হচ্ছে কান। আর দেখার মূল মালিক দৃষ্টিশক্তি কিন্তু দেখার মাধ্যম হচ্ছে চোখ।

মানুষ যখন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে তখন দেখে তা ঠিকই এবং লোকের সঙ্গে যখন স্বপ্নে কথা বলে তখন লোকের যে কথা শোনে তা ঠিকই শোনে কিন্তু এই দেখা কি চোখের মাধ্যমে দেখে? আর যখন স্বপ্নে কিছু শোনে তখন কি কানের মাধ্যমে শোনে। তখন মাধ্যম ছাড়াই দেখে ও মাধ্যম ছাড়াই শোনে। ঠিক তেমনই মানুষের যখন মৃত্যু হয়ে যাবে তখন মাধ্যম ছাড়াই দেখবে এবং মাধ্যম ছাড়াই শোনবে। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুটাকে কিছুটা ঘুমের সঙ্গেও তুলনা করা চলে। যেমন মূসা(আ)-এর সঙ্গে তার কওমের কিছু লোক যখন আল্লাহকে দেখতে তুর পাহাড়ে যায় তখন আল্লাহই বলছেন তারা এক আলোর ঝলকে মরে গেল এবং পরে তাদেরকে আবার জিন্দা করা হয়েছিল। এভাবে যারা মরে জেন্দা হয়েছেন, তারা তো অবশ্যই মৃত্যু অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। যেমন সূরা বাকারায় ২৫৯ নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন– কোন এক জনপদে এক ব্যক্তি কিছু ভাঙ্গা ঘর বাড়ী দেখে মনে মনে ভাবছিল 'আল্লাহ, কি করে এভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জনপদের কে কোথায় মরে পড়ে রয়েছে তাদের পুণঃরায় একত্রিত করবেন। অবশ্য তার বিশ্বাসী দিল ছিল তবে তার কৌতুহলী মনের

এটা একটা প্রশ্ন ছিল। তাকে আল্লাহ দেখানোর জন্য তার মৃত্যু দিলেন এবং ১ শত বছর পর তাকে জিন্দা করে জিজ্ঞেস করলেন, বলত তুমি কতদিন এভাবে ঘুমিয়েছিলে? সে লোক তার জবাবে বলল ১ দিন পুরা অথবা দিনের একটা অংশ অর্থাৎ কিছু সময় ঘুমিয়েছিলাম। এ ধরণের আরও যেসব কথা কুরআন ও হাদীস থেকে পাওয়া যায় তাতে বুঝা যায় মৃত্যুটা ঘুমের মতই একটা ব্যাপার। ঘুমের মধ্যে মানুষ যেমন স্বপ্নে দেখে আর সে বোঝে যে, সে সত্যই কিছু দেখছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই আমরা দেখছি যে, সে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে, মনে হচ্ছে, সে একেবারেই মৃতের মত পড়ে আছে কিন্তু সেই মুহূর্তে সে কত কি স্বপ্ন দেখছে। ঠিক তেমনই মানুষ যখন প্রকৃতই মরে যাবে তখন জীবিত লোকে দেখবে যে সে সব দিক থেকেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তখন সে ফেরেশতাদের সঙ্গে কথা বলবে, সে বুঝবে, সে দেখবে, সে শুনবে। এখন দেখে চোখের মাধ্যমে আর তখন দেখবে বিনা মাধ্যমে। মানুষের রূহ একটা অদৃশ্যমান শক্তি। এই শক্তির সঙ্গে রয়েছে তার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, অনুভূতি, জ্ঞানবুদ্ধি ইত্যাদি বৃত্তিগুলি। মানুষ জীবিত অবস্থায় চলে দেহকে বাহন করে আর মৃত্যু অবস্থায় চলবে বাহন ছাড়াই। একটা মানুষ যেমন এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যখন কোন গাড়ীতে করে যায় তখন গাড়ী চলে সে চললে, গাড়ী থামলে সে থামে, গাড়ী এক্সিডেন্ট করলে সে এক্সিডেন্ট করে কিন্তু যখন সে গাড়ী থেকে নেমে যায় তখন সে যেমন গাড়ীকে দেখে মনে করে যে এই গাড়ীতে করে আমি এত সময় চলাফেরা করেছি এখন ঐ গাড়ী রইল আর আমার মত আমি অন্যত্র চলে যাচ্ছি। ঠিক তেমনই মানুষ মরে গিয়ে তার দেহকে তেমনই দেখবে যেমন জেন্দা মানুষ দেখে আর মনে করে যে, অমুকের লাশটা পড়ে রয়েছে। ঐ লাশের মধ্যে যে জীবনটা ছিল সে জীবনটা বেরিয়ে গিয়ে অন্যান্যদের মত সে নিজেও দেখে যে ঐ যে আমার দেহ বাহনটা পড়ে রয়েছে! বুঝবে সে ওটা আর আমার ব্যবহারযোগ্য নেই এবং এখন থেকে আমাকে বাহন ছাড়াই চলতে হবে। মানুষ স্বপ্ন দেখতে দেখতে যেমন সে কখন আবার দেখা ছেড়ে দেয় তা সে টের পায় না ঠিক তেমনই মানুষ মৃত্যুর পর যারা ঈমানদার ব্যক্তি তারা ঐরূপ কবরের সওয়াল জওয়াবের পরে মাঝে মাঝে অচেতন অবস্থায় ও মাঝে মাঝে চেতন অবস্থায় কাটাবে এরপর হঠাৎ

একদিন পূর্বেকার দেহের ন্যায় দেহ নিয়ে উঠে পড়বে কেয়ামতের মাঠে। আমল নামা উড়তে দেখবে সবাই মাথার উপরে। মাঠে যত মানুষ থাকবে মাথার উপরে ততগুলি আমল নামা পাখীর মত উড়তে থাকবে। এরপর সহসাই আমল নামাগুলি এসে কারো সামনের দিক থেকে এসে ডান হাতে পড়বে, আর কারো পিছনের দিক থেকে এসে বাম হাতে পড়বে।

সেদিন ঐ মাঠে দাঁড়িয়েই মানুষ বেহেশ্‌ত এবং দোযখ দেখতে পাবে। দোযখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নবীগণও এমনভাবে শিউরে উঠবেন যে নবীদের গা থেকে পর্যন্ত পশম খসে পড়ে যাবে–(ওয়াজীয়া ইয়াও মাইজিম বি-জাহান্নাম...এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছে তফসীরে কাদেরীতে) যদিও তারা নিশ্চিতভাবে বুঝবেন যে তারা ঐ দোযখে যাবেন না। এমন একটা ভীষণ দিন রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই সামনে, কাজেই দিন থাকতে আমাদের এখনই হুঁশিয়ার হওয়া উচিত যেন সেই ভীষণ দিনটিতে আমরা আগুনের দেশের নাগরিক না হয়ে পড়ি। বুদ্ধিমান তারাই যারা সেই দিনটিকে সামনে রেখেই এই পৃথিবীর দিনগুলির কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। আল্লাহ আমাদের এমন বুদ্ধি দাও যেন তোমার সেই ভীষণ দিনটার জবাবদিহির ভিত্তিতেই এই দুনিয়ার সমাজ ব্যবস্থাকে গড়তে পারি। আর পারি যেন পরকালের স্থায়ী শান্তির মুকাবেলায় এই দুনিয়ার অস্থায়ী আয়াশ আরামকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে। আর পারি যেন পরকালের ঘটনাবলীকে দেখা বিশ্বাসের ন্যায় বিশ্বাস করতে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে।

আলমে বরযখ

আলমে বরযখ হলো মানুষের মৃত্যুর পর কিয়ামত বা শেষ বিচারের জন্য পুনরুত্থান পর্যন্ত অপেক্ষমান কাল। এটাকে কবরের সুপ্তি কালও বলা যায়। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন মানুষের রূহকে সৃষ্টি করে কর্মের পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্ব পর্যন্ত আলমে আরওয়াহ বা রূহ জগতে অপেক্ষমান রাখেন এবং যথাসময়ে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মধ্যে রূহ সঞ্চার করে রক্ত মাংসের আবরণ পরিয়ে মানব শিশু হিসেবে আলমে দুনিয়া বা এ পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে পাঠান। আলমে দুনিয়ার পালা শেষ হলে একটি কঠিন লগ্ন এসে যায়। সে কঠিন লগ্নটি হল মৃত্যু। মৃত্যুর পরে

আবার কবরে অপেক্ষার পালা। কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হবে। এ জগতের নাম আলমে বরযখ। এ জগতে মানুষ ও জ্বীন যার যার দুনিয়ার কর্মফল অনুযায়ী জান্নাতের শান্তি অথবা জাহান্নামের শান্তি কিছুটা ভোগ করবে। আলমে বরযখের এ সুপ্ত কালটিকে রেল, স্টীমার বা বিমান যাত্রীদের বিশ্রাম কক্ষের সাথে তুলনা করা যায়। এখানে সে যে শ্রেণীর বা মর্যাদার যাত্রী তাকে সে অনুযায়ী আরাম আয়েশে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর কিয়ামতে পুনরুত্থান করে হাশরের ময়দানে বিচারের সম্মুখীন করা হবে। দুনিয়ার কর্মফল অনুযায়ী বিচার হবে। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা জান্নাতে দেবেন। সেখানে সে অনন্তকাল সুখ শান্তিতে থাকবে। আর যাকে ইচ্ছা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে অনন্তকাল শান্তি ভোগ করবে। তাহলে আমরা কঠিন মৃত্যু যবনিকার পূর্বে তিনটি স্তর এবং পরে তিনটি স্তরের খবর পাই। পূর্বের তিনটি স্তর হলো রূহ জগত, মাতৃজঠর ও পৃথিবীর জগত। এর মধ্যে পৃথিবীর জগত কর্মময়। এর গুরুত্ব খুবই বেশি। মৃত্যুর পরের তিনটি জগত হল আলমে বরযখ, কিয়ামত বা হাশর এবং আখিরাতের কর্মফল দিবস। এখানে কর্মফল দিবসের গুরুত্ব খুব বেশি। দুনিয়ার কর্মফলের ভিত্তিতেই আল্লাহ হাশরের বিচারে বান্দার জন্য অনন্তকালের সুখ সম্ভোগের নিবাস জান্নাত কিংবা অনন্তকালের কঠিন শাস্তির স্থান জাহান্নাম বরাদ্দ করবেন।

পরিশিষ্ট ঃ প্রাসঙ্গিক হাদিস

১। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয় তখন কাল রং এবং উজ্জ্বল চক্ষু বিশিষ্ট দু'জন ফিরিশ্‌তা হাজির হন। তাদের একজনের নাম মুনকার ও অন্য জনের নাম নকীর। তারা মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে উঠিয়ে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে তোমার মতামত কি? দুনিয়াতে যে ব্যক্তি যে মত পোষণ করতো, তখন তার যবান থেকে তাই ব্যক্ত হবে। যদি সে ব্যক্তি মুমিন মুসলমান হয় তবে বলবে যে তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তার জবাব শুনে ফিরিশতাদ্বয় বলবে যে তুমি যে এরূপ বলবে তা আমরা জানতাম। অতপর ঐ ব্যক্তির কবর সত্তর হাত দীর্ঘ ও সত্তর হাত

প্রশস্ত এবং তা আলোকিত করে দেয়া হবে। তারপর তাকে বলা হবে তুমি শুয়ে বিশ্রাম কর। কিন্তু ঐ ব্যক্তি বলবে যে, আমাকে অনুমতি দিন, আমি আমার পরিবার বর্গের কাছে গিয়ে তাদেরকে আমার এ খবর জানিয়ে আসি। ফিরিশতাদ্বয় বলবেন, তুমি নববধুর মত শুয়ে থাক, যে নববধুকে একমাত্র প্রিয় স্বামী ছাড়া আর কেউ জাগায় না। আল্লাহই তোমাকে এই শান্তির নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলবেন।

পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তি মুনাফেক হলে ফিরিশতাদ্বয়ের প্রশ্নের জবাবে বলবে, "আমি কিছু জানি না।" তখন ফিরিশতাদ্বয় বলবেন যে, আমরা জানতাম যে, তুমি এরূপই জবাব দেবে। তখন তারা যমীনকে আদেশ করবে যে, একে পেষণ যন্ত্রের মত সবলে পিষে ফেল। আদেশ মাত্র যমীন তাকে এমনভাবে পিষে ফেলবে যে তার একদিকের পাঁজরের হাড় অন্য দিকে চলে যাবে। আল্লাহ তাকে কবর থেকে না ওঠানো পর্যন্ত সে এভাবেই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

২। হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) কে বললেন, হে ওমর! যখন তোমার জন্য সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ ও দেড় হাত পাশ যমীনের ব্যবস্থা করা হবে, যখন তোমার আত্মীয় স্বজনরা তোমাকে গোসল করাবে, সুগন্ধি লাগাবে এবং কাফন পরিয়ে কবরে রেখে আসবে তখন তোমার অবস্থা কেমন হবে? তারপর মুনকার-নকীর ফিরিশতাদ্বয় হাজির হবে, বিজলীর মত তেজবিশিষ্ট তাদের চোখের দৃষ্টি এবং রুক্ষ ঝুলন্ত চুল হবে। তারা তোমাকে ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শন করবে। তারা তোমাকে প্রশ্ন করবে, "বল তোমার আল্লাহ কে? তোমার দ্বীন কি?"

হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমার ভিতরে যে প্রাণ আছে, তখনও কি আমার ভিতরে সে প্রাণ থাকবে? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হাঁ। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তবে তা-ই আমার জন্য যথেষ্ট।

৩। হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে জনৈক আনসারের জানাযায় উপস্থিত হলাম। তখনও কবর তৈরি সমাপ্ত না হওয়ায় রাসূল (সঃ) বসলেন। তখন তার মুখমণ্ডলে অত্যধিক গাম্ভীর্যের ছাপ ফুটে ওঠায় আমরা সবাই নীরব রইলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক খানা লাঠি দ্বারা মাটিতে দাগ

কাটছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মাথা জাগিয়ে বললেন, "কবর আযাব হতে আমি আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" এ কথাটি তিনি পরপর তিনবার বললেন। অতঃপর বললেন, যখন কোন মুমিন বান্দা দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে পরলোকগমন করে তখন সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল মুখবিশিষ্ট সুন্দর ফিরিশতাগণ বিহিশ্‌তী কাফন এবং সুগন্ধি নিয়ে মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে এসে তার সামনে বসে। অতঃপর মালাকুল মওত উপস্থিত হয়ে বলেন, হে শান্ত ও পবিত্র রূহ। তোমার প্রভুর নির্দেশে তার রহমত ও ক্ষমার দিকে রওয়ানা হও। তখন সে আত্মা এমন সহজ, সরল ও প্রশান্তভাবে থাকে যে, ভেতর থেকে বের হওয়া মাত্র তাকে মালাকুল মওত ধরে ফেলেন। কোন পাত্র থেকে পানির ফোটা ঝরে পড়ার মত ঐ আত্মা অতি সহজেই বের হয়ে আসে। যে সকল ফিরিশতা কাফন ও সুগন্ধি নিয়ে আসে তারা মুহূর্তে আত্মাকে মালাকুল মওতের হাত থেকে নিয়ে কাফন পরিয়ে ও সুগন্ধি লাগিয়ে দেয়। ঐ সুগন্ধি কস্তুরী অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময়। যার সমতুল্য দুনিয়াতে সুগন্ধি নেই। ফিরিশতারা তাকে শূন্যে নিয়ে যাবার কালে শূন্যমণ্ডলের ফিরিশ্‌তারা জিজ্ঞেস করে যে, এমন সুঘ্রাণ কিসের? উত্তর দেয়া হয়, অমুকের পুত্র অমুকের। খুবই শ্রদ্ধার সাথে তা বলা হয়। প্রথম আসমানের কাছে গিয়ে দরজা খুলে দিতে বলায় দরজা খুলে দিয়ে তথাকার ফিরিশতারা ঐ ব্যক্তিকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে এবং তারা তাকে দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এভাবে সাত আসমান অতিক্রম করার পর আল্লাহপাক বলেন, এ ব্যক্তির নাম ইল্লিঈনের দপ্তরে লিখিয়ে দিয়ে পুনরায় তাকে দুনিয়াতে নিয়ে যাও। আমি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি এবং মাটিতেই প্রত্যাবর্তন করাচ্ছি আবার তাকে মাটি থেকেই উত্তোলন করব।

ফিরিশ্‌তারা আত্মাকে দেহে ফিরিয়ে দিতেই অন্য দুজন ফিরিশতা এসে জিজ্ঞেস করেন, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? সে জবাবে বলে আমার রব আল্লাহ এবং দ্বীন ইসলাম। আবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয় মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? সে জবাব দেয় তিনি আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। তিনি আমাদের জন্য সত্য দ্বীন এনেছেন। আবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, একথা তোমাকে কে শিখিয়েছে? সে জবাব দেয়, আমি পবিত্র কুরআন পড়েছি, কুরআনের উপর ঈমান

এনেছি এবং একে সত্য বলে স্বীকার করেছি। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। তাকে বিহিশতের বিছানা করে দাও। বিহিশতের পোশাক পরিয়ে দাও। বিহিশতের সুগন্ধি লাভের জন্য বিহিশতের সকল দরজা খুলে দাও। দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত তার কবর প্রশস্ত করে দেয়া হয়। অতপর এক সুদর্শন ব্যক্তি তার কাছে এসে বলে, আমি তোমাকে একটি প্রতিশ্রুতি ও আনন্দদায়ক সুসংবাদ দেবো। আজ সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করার দিন। লোকটি জিজ্ঞেস করে, আপনি কে? আগন্তুক জবাবে বলে, "আমি তোমার সৎকাজ।" তখন লোকটি বলে, হে প্রভু! আপনি কিয়ামত করে দিন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বললেনঃ যখন একজন কাফিরের মৃত্যু আসন্ন হয়, পার্থিব সকল বিষয় ও ব্যাপার তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে থাকে। তখন আসমান হতে ভয়ঙ্করদৃশ্য কাল মুখবিশিষ্ট দু'জন ফিরিশতা এসে তার কাছে বসে। ফিরিশতাদ্বয় একটি চট নিয়ে আসে। তারপরই মালাকুল মওত উপস্থিত হয়ে বলেন, হে অপবিত্র রূহ! তুমি আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির দিকে রওনা হও। একথা শুনে রূহ লোকটির সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। মালাকুল মওত তাকে ধরে এমনভাবে টেনে বের করে যেমন ভাবে ভিজা উল বা পশম হতে লৌহ শলাকা বের করা হয়। তখন লোকটির যাবতীয় শিরা-উপশিরা ছিড়ে যায়। আত্মাকে তখন ফিরিশতাদের আনীত চটে পেচিয়ে রাখা হয়। উক্ত নাপাক আত্মার দুর্গন্ধ তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ আত্মাকে নিয়ে যখন শূন্যমণ্ডলে যাওয়া হয় তখন তথাকার ফিরিশ্তারা তার পরিচয় জিজ্ঞেস করে। অত্যন্ত অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সাথে তার পরিচয় দান করা হয়। তাকে নিয়ে প্রথম আসমানের দরজায় পৌছলে তা খুলে দেয়া হয় না। এভাবে সকল আসমান হতে সে প্রত্যাখ্যাত হয়।

তখন আল্লাহ বলেন, এ ব্যক্তির নাম সিজ্জীনের দপ্তরে লিখিয়ে এর রূহকে দুনিয়ার দিকে ফেলে দাও। সেমতে ঐ অপবিত্র আত্মাকে যমীনের দিকে নিক্ষেপ করা হয়। অতপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াত পাঠ করলেন– "ওয়ামাইঁ ইউশরিক বিল্লাহি ফাকাআন্নামা খাররা মিনাস সামায়ি ফাতাখাত্বাফুত ত্বাইরু আও তাহওয়ী বিহীর রীহু ফী মাকানিন সাহীক্ব।" অর্থাৎ যে আল্লাহর সাথে শরীক করে তাকে আসমান থেকে নিক্ষেপ করা হয়। পাখি তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় অথবা বাতাস তাকে

কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে। অতপর ঐ আত্মা পূনরায় দেহে প্রবেশ করে। তখন দুজন ফিরিশতা কবরে এসে তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করে, তোমার রব কে? সে জবাব দেয়, হায় হায়! আমি জানি না। তাকে আবার জিজ্ঞেস করে মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? এর জবাবে সে বলে হায় পরিতাপ! তাও তো জানি না।

তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসে এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। একে জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও, জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও এবং জাহান্নামের সকল দরজা খুলে দাও যাতে সে জাহান্নামের শাস্তি ও দুর্গন্ধি পেতে পারে। (সাথে সাথে এ আদেশ পালিত হয়। এছাড়াও) কবরের সংকীর্ণতার জন্য লোকটির পাজরের হাড় চুরমার হয়ে যায়। ইত্যবসরে দুর্গন্ধি পোশাক পরে কুৎসিৎ কুদৃশ্য এক ব্যক্তি এসে লোকটিকে বলে, তুমি ধ্বংস হও, তোমাকে যেদিনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল আজ সেদিন। লোকটি আগন্তুককে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? সে জবাবে বলে, "আমি তোমার অসৎকর্ম"। তখন লোকটি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, হায় হায়! কেয়ামত যেন না হয়।

উপরোল্লিখিত হাদীস সমূহ দ্বারা কবরের সওয়াল জওয়াব, কবর আযাব ও বিহিশতের নিয়ামত প্রাপ্তি প্রমাণিত হচ্ছে।

ওয়ামা তৌফিকী ইল্লা বিল্লাহ

দ্বিতীয় অধ্যায়
আলমে বারযাখ
(পরদার আড়ালের জগত)

মৃত্যুর পর এবং কিয়ামতের পূর্বের জগতটাকে বলে আলমে বারযাখ বা পর্দার আড়ালের জগত।[১] এ জগতে মানুষ কি অবস্থায় আছে এবং কি অবস্থায় থাকবে, এ নিয়ে যেমন আমার মনে প্রশ্ন রয়েছে তেমন বহু লোকের মনেই রয়েছে প্রশ্নটা। তাই কুরআন-হাদিস থেকে এর কাছাকাছি একটা সঠিক ধারণা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি বহু দিন ধরে। অতঃপর যে ধারণার উপর আমি নিজে আশ্বস্ত হয়েছি তাই কুরআনী দলীল সহকারে 'কবরের সওয়াল জওয়াব' বইটার শেষাংশে যোগ করে দিচ্ছি। আশা করি এর থেকে পুরাপুরি না হলেও সঠিকের খুব কাছাকাছি একটা ধারণা লাভ করতে পারব।

আশা করি এর থেকে মুসলিম জাতি মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা গ্রহণ করতে পারবে।

ওলামা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে যদি আমার এ ধারণা সঠিকের কাছাকাছি না হয়ে থাকে তবে তাঁরা কুরআন ও হাদিসের দলীল সহ আমাকে লিখে জানালে তা পরবর্তী সংস্করণে যোগ করে দেবো ইন্‌শাআল্লাহ্।

কবরের জীবনই আলমে বারযাখ

আমরা সব সময় বলে থাকি যে মরে গিয়ে কবর থেকে ফিরে এসে কেউ বলেনি যে সে কবরে বা মৃত্যুর পর কি অবস্থায় ছিল। দেখলাম আল্ কুরআনে তো এ ব্যাপারে বহু পূর্বেই পড়েছি। পড়েছি ঠিকই, তবে বলতে গেলে তা অন্ধকারে বসেই পড়েছিলাম। যা ছাত্র জীবনে পড়েছিলাম তার ওপর চিন্তা ভাবনা তখন করিনি, চিন্তা করছি এখন এই জীবনের শেষ মুহূর্তে। আর চিন্তা করে কুরআন হাদিস থেকে বহু প্রশ্নেরই জওয়াব পেয়ে

১. সম্ভবতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়টিই বইয়ের পাণ্ডুলিপি হিসাবে লেখকের জীবনের শেষ লেখা। প্রকাশকের অনুরোধে নারায়ণগঞ্জের বাসায় বসে তিনি এ অংশটি রচনা করেন এবং কবরের সওয়াল জওয়াব পুস্তিকার শেষ দিকে দ্বিতীয় অধ্যায় হিসেবে আলমে বারযাখ শিরোনামে যুক্ত করতে বলেন। এর কয়েকদিন পরই তিনি আমেরিকা সফরে যান এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি লেখার শক্তি আর ফিরে পাননি।—প্রকাশক

যাচ্ছি আল্লাহর মেহেরবানিতে। এ প্রশ্নটারও জওয়াব কুরআন থেকেই গেয়ে গেলাম। যা প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। আল কুরআনের সূরা বাকারার ২৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন–

"অথবা উদাহরণ স্বরূপ সেই ব্যক্তির কথা চিন্তা কর– যে ব্যক্তি এমন একটা বস্তিতে পৌঁছল যে বস্তি উপুড় হয়ে ধ্বসে পড়েছিল। (এই ঘটনা দেখে) সে ব্যক্তি বলল, এই জনপদ যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে তা আবার কিরূপে জীবন্ত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তার প্রাণ হরণ করে নিলেন, (সে ব্যক্তি মরে গেল) এবং সে এক শত বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় পড়ে রইল। তার পর আল্লাহ তাকে পুনরায় জীবিত করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বল কতকাল এরূপ অবস্থায় পড়েছিলে? সে বলল ঃ পুরা একটা দিন হবে অথবা মাত্র দিনের কিছু অংশ বা কয়েক ঘণ্টা হবে এরূপ (ঘুমন্ত অবস্থায়) পড়েছিলাম। আল্লাহ বললেন ঃ তোমার উপর দিয়ে এমনি অবস্থায় পুরা একশতটি বছর কেটে গেছে। এখন তোমার খাদ্য ও পানীয় পরীক্ষা করে দেখ যে তা কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি বা কোন প্রকার পরিবর্তন দেখা দেয়নি (তা যেমন ছিল তেমনই রয়েছে)। অপর দিকে তোমার গাধাটির দিকে চেয়ে দেখ যে (তার দেহ পাঁজর পর্যন্ত জীর্ণ হয়ে গেছে) আর আমি এটা এ জন্যে করেছি যে এটাকে আমি পরবর্তীদের জন্য একটা দৃষ্টান্ত বানিয়ে রাখতে চাই। তার পর (তোমার গাধার দিকে) দেখতে থাক যে আমি কি ভাবে তার এই হাড়গোড়কে উঠিয়ে তার সঙ্গে গোশ্ত ও চামড়া পরিয়ে দেই। অতঃপর আল্লাহর কুদরতের সত্য ব্যাপার যখন তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল তখন সে বলল ঃ আমি জানি যে আল্লাহ সর্ব শক্তিমান।"

আল্ কুরআনের এই ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে মৃত্যুর পর তার সওয়াল-জওয়াব শেষ হয়ে গেলে (যদি সে ব্যক্তি নেককার হয় তবে) সে ব্যক্তি এমনভাবে ঘুমিয়ে থাকবে যে পরকালে যখন তাকে জিন্দা করা হবে তখন সে ব্যক্তি মনে করবে যেন রাত্রি ১০টার দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এখন সকাল হয়েছে তাই উঠে পড়েছি। এর পর বুঝতে পারবে যে না তো; এটা তো দেখছি কেয়ামতের মাঠে উঠে পড়েছি।

এর পর এই একই কথার সমর্থনে ১৭ পারার প্রথম আয়াত অর্থাৎ সূরা আম্বিয়ার প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলছেন– "মানুষের হিসাব নিকাশের দিন অতি নিকটে এসে গেছে, অথচ তারা এখনও গাফলতির মধ্যে

নিমজ্জিত হয়ে এবং আল্লাহ বিমুখ হয়ে পড়ে আছে।" এখান থেকেও ঐ একই কথার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে যে হিসাব নিকাশের দিন অতি নিকটে আসার অর্থই হল মৃত্যুর পর যে কত হাজার হাজার বা লক্ষ কোটি বছর পরে কিয়ামত হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন কিন্তু এই দীর্ঘ সময়টা নিকটই মনে হবে; দীর্ঘ বলে মনে হবে না। যেমন আমরা রাতে ঘুমালে সকাল হওয়া পর্যন্ত সময়কে দীর্ঘ সময় মনে করি না। ঠিক তদ্রূপই মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় আল্লাহর কাছে বা বাস্তবে যত দীর্ঘ সময়ই হোক না কেন, মৃত ব্যক্তিদের কাছে তা মোটেই দীর্ঘ বলে মনে হবে না। আর তা যদি দীর্ঘ বলে মনে হতই তাহলে—

১। ঐ ব্যক্তি— যার কথা পূর্বে সূরা বাকারার আয়াতে পড়ে আসছি ১০০ বছর মৃত অবস্থায় থাকার পর আল্লাহর প্রশ্নের জবাবে বলল যে "হয়ত পুরা একটা দিন অথবা মাত্র কয়েক ঘণ্টা হতে পারে। অথচ আল্লাহ বললেন যে, না, তোমার উপর দিয়ে একশতটি বছর এমনিভাবে কেটে গেছে। অথচ তার কাছে মনে হয়েছে কয়েক ঘন্টা। আর আল্লাহ বলছেন যে তোমার ঘটনা পরবর্তীদের জন্যে একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ করে রাখলাম যেন তারা বোঝে মৃত্যুর পরের দীর্ঘ সময় মৃত ব্যক্তির নিকট দীর্ঘ সময় বলে মনে হবে না। কাজেই সূরা আম্বিয়া আল্লাহ শুরুই করলেন এই কথা বলে যে মানুষের হিসাব নিকাশের দিন অতি নিকটে এসে গেছে। অর্থাৎ সে দিন যত দূরেই থাক না কেন তা তোমাদের টের পাওয়ার কথা নয়, তোমাদের কাছে সে দিন অতি নিকটেই।

মৃত্যুটা ঘুমের মত এবং মৃত্যুর পরে মানুষ যা কিছু দেখবে এটা তার কাছে স্বপ্নের মত মনে হবে, অর্থাৎ স্বপ্ন দেখার সময় তার মনে হয় না যে সে এটা স্বপ্নেই দেখছে। তার কাছে মনে হয় এটা বাস্তবই। যেমন এই মাত্র ২ ঘন্টা পূর্বে আমি একটা স্বপ্ন দেখছিলাম যখন একজনকে দেখলাম যার মৃত্যু হয়ে গেছে প্রায় ৪/৫ বছর পূর্বে কিন্তু আমি স্বপ্নের মধ্যে তা টেরই পাচ্ছিলাম না যে এটা স্বপ্ন। আমার নিকট মনে হচ্ছিল যে এটা আমার জাগ্রত অবস্থায় বাস্তবেই দেখছি। আবার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন ছুটে গেছে, আমি ঘুমিয়ে রয়েছি। একটু পরে জেগেই দেখি যে না তো একটু পূর্বে যা

দেখছিলাম তা তো বাস্তব নয়, ওটা ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখেছি। ঠিক তেমনই মৃত ব্যক্তি কখনও পূর্বের মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে রুহানি সাক্ষাত লাভ করতে পারবে এবং সেটাকে বাস্তবই মনে হবে কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে হবে স্বপ্নের মত দেখা।

এর সমর্থনে আল্ কুরআনের আরেকটি আয়তের উল্লেখ করছি। যার থেকে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। তা হচ্ছে ২৪ পারা সূরা যুমারের ৪২ নং আয়াত। সেখানে আল্লাহ বলছেন–

"তিনি তো আল্লাহ্ই যিনি মৃত্যুর সময় রূহ্গুলিকে কবজ করেন। আর যার এখনও মরার সময় আসেনি তাদের ঘুমের সময় তাদের রূহ্গুলি কবজ করে নেন। তার পর যার উপর তিনি মৃত্যুর ফয়সালা করে ফেলেন তার রূহ্কে তিনি আটকে ফেলেন, (সে তার দেহে আর ফিরে যেতে পারে না, দেহটাও রূহ্ পুণঃগ্রহণের অযোগ্য হয়ে যায়। এটা আল্লাহরই নির্দেশে হয়) এবং অন্যান্যদের রূহ্কে (যার মৃত্যুর ফয়সালা আল্লাহ তখনও করেন নি) আল্লাহ ফেরত পাঠিয়ে দেন। এর মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে"।

এর থেকে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে আল্লাহই বলছেন যে বুঝার মত অনেক কিছু নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু সেটা কি? তা হচ্ছে কমপক্ষে নিম্নের জিনিসগুলি ঃ যথা–

১। ঘুমের পরে সে যে জাগবেই তার কোন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। যেমন আমার প্রতিবেশীর মধ্যে ২ ব্যক্তিকে দেখেছি যে ভালমানুষ সুস্থাবস্থায় রাত্রিতে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। যার কোন রোগ ব্যধি নেই। কিন্তু সকালে দেখা গেল যে সে মরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বয়স তার তখন বড় জোর ২৪/২৫ বছর। আর একজনকে দেখেছি, তিনি অবশ্য একজন বৃদ্ধ ডাক্তার। ভাল মানুষ রাত্রে ঘুমিয়ে রয়েছেন। তার স্ত্রী যিনি স্বামীর কাছেই শুয়েছিলেন– সকালে নামাজের জন্য জাগাতে গিয়ে দেখেন যে গায়ে ধাক্কা দিলে পুরা শরীরটাই নড়ে ওঠে। তার পর লক্ষ্য করে দেখেন যে ডাক্তার সাহেব মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। অথচ তার একই বিছানায় শোয়া তার স্ত্রী টেরই পাননি যে কখন ডাক্তার সাহেব মারা গেছেন। এটা তো বললাম দেখা কথা। আর এই ধরনের খবর শুনেছি তো বহুতই।

যাই হোক উপরোক্ত আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা গেল যে ঘুম আর মৃত্যু সমান। ঘুমের সময় মানুষ যেমন অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকে ঠিক তেমনই কবরের সওয়াল -জওয়াবের পর মানুষ (যারা ঈমানদার) অচেতন অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়বে; পরে জেগেই দেখবে যে হাশরের মাঠে উঠে পড়েছে। আর বদকাররা যে গোরআজাব ভোগ করবে তার ধরনটা কেমন হবে তা অনেক ধরনের ধারণা মানুষের রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে কিছু যুক্তিভিত্তিক কথা আছে যা কুরআন হাদিসের সঙ্গে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না। যেমন– ইমাম গাজ্জালী তার এক কিতাবে লিখেছেন ঃ (তিনি লিখেছেন তার ভাষায় আর আমি লিখছি আমার ভাষায় তবে মূল বক্তব্যের মধ্যে বিন্দুমাত্রও কোন রদবদল নেই।) তিনি লিখেছেন— গোর আজাব সম্পর্কে যে সব হাদিস আছে তা প্রায়ই রূপক। অর্থাৎ আজাবটা কেমন হবে তার উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে তার আজাবটা এমন হবে যেন– অত্যন্ত বিষধর সাপে কামড়ালে তার দেহে যেমন জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় ঠিক তেমনই যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন সাপে কামড়াবে না। তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন সে যুক্তিটা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

তিনি লিখেছেন, কিছু লোক যদি জাহাজে করে সমুদ্র পথে কোথাও যাওয়ার সময় সে জাহাজ যদি পথে কোন দ্বীপ পেয়ে সেখানে কিছুক্ষণের জন্য থামায়। আর ইঞ্জিনটা ঠাণ্ডা করে নেয়ার জন্য যদি ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে ৫/৬ ঘন্টা নোঙ্গর করে থাকে। এই সুযোগে যদি কিছু যাত্রী দ্বীপটা ঘুরে দেখার জন্য জাহাজ থেকে নেমে যায় আর জাহাজের ক্যাপ্টেন যদি বলে যে বেলা ১০টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত জাহাজ এখানে থাকবে। ঠিক ৪ টায় এখান থেকে ছেড়ে চলে যাব। আপনারা যারা দ্বীপে নামবেন তারা অবশ্যই ৪ টার পূর্বে জাহাজে হাজির হবেন নইলে জাহাজ ছেড়ে গেলে দেশে ফেরার আর উপায়ই থাকবে না। তার পর কিছু লোক নামল। নেমে দেখে যে দ্বীপে খাওয়ার মত বহু ফলফলাদির গাছ রয়েছে এবং বহুত ফল পেকে রয়েছে। তা দেখে তারা গাছে উঠে কিছু ফল পাড়ল এবং খুশী মনে মজা করে খেয়ে নিল। এর পর দেখে যে দ্বীপে ঝিল কাকরের মধ্যে বহু সোনার দানা ছড়িয়ে পড়ে আছে। আর তা দেখে যদি কিছু লোক ৪টায় জাহাজে ওঠার কথা ভুলে গিয়ে সোনার দানা কুড়াতে থাকে আর মনে মনে ভাবে যে এগুলি বিক্রি করে বিরাট ধনী হয়ে যাব। তার মধ্যে কিছু লোক ৪টার পূর্বেই জাহাজে উঠে গেল আর কিছু লোক যারা সোনার দানা দেখে

৪টায় জাহাজে ওঠার কথা ভুলে গিয়েছিল তারা যখন ফিরে এসে দেখে যে জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। আর যখন বুঝবে যে জীবনেও কোনদিন দেশে ফিরে যেতে পারবে না। তখন তারা যেমন মনে করবে যে এই সোনাই ছিল তাদের জন্যে কাল বা জীবন ধ্বংসের মূল কারণ। তখন এতো সোনা দানার আধা পয়সারও যে মূল্য নেই তা ভাল করেই বুঝবে আরও বুঝবে যে সন্ধ্যা হলেই দ্বীপের হিংস্র জীব জানোয়ারের পেটে যেতে হবে। আর জীবনেও কোনদিন বাড়ী ফিরতে পারবে না এবং স্ত্রী পুত্র পরিজন কাউকে আর কোন দিনও দেখতে পাবে না, শুধু তাই নয় বরং জীবনটাও আর বেশীক্ষণ নেই। হায়াত মাত্র সন্ধ্যা পর্যন্ত। তখন তার মনে অনুশোচনার যে জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে তা বিষধর সাপের দংশনের চাইতে বহু গুণ বেশী। ঠিক তদ্রূপ যারা গোনাহগার তাদের মৃত্যুর পর প্রথমে বেহেশ্‌তের নিকট নিয়ে বেহেশ্‌ত দেখান হবে আর বলা হবে, 'তোমার বদ আমলের জন্য এই বেহেশ্‌ত চিরদিনের জন্য হারিয়েছ। এর পরে তাকে দোজখের নিকট নিয়ে দোজখ দেখিয়ে বলা হবে— "তোমার বদ আমলের কারণে চিরদিন এই জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হবে।" তখন তার মধ্যে অনুশোচনার যে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে– ঐ যন্ত্রণাই তার ঘোর আজাব। এ যন্ত্রণা যে কত অধিক তা গোনাহগাররা কবরে গিয়ে না দেখা পর্যন্ত বুঝতে পারবে না।

আমি একদিন জাহাজ ফেল করার অনুশোচনার যন্ত্রণা কিছুটা ভোগ করেছিলাম। তখন ইমাম গাজ্জালীর লেখা আমার পড়া হয়ে গেছে। এটি সেই সময়ের কথা। একদিন ঢাকা থেকে বাড়ী যাওয়ার পথে এক স্থান থেকে লঞ্চ পালটাতে হবে। আমি সেখানে অনেকক্ষণ নদীর দিকে চেয়ে বসে আছি যে দেখি কখন লঞ্চ আসে। সেখান থেকে আমাদের বাড়ী মাত্র ৫ মাইল দূরে। হেঁটে যেতে বড় জোর দু' ঘন্টা সময় লাগতে পারে। সঙ্গে একটা মাত্র স্যুটকেস– যা হাতে করে ৫ মাইল পথ হেঁটে যাওয়া যৌবনকালে মোটেই কোন কষ্টের ব্যাপার ছিলনা। বসেছিলাম লঞ্চঘাটের মসজিদের মধ্যে। এ সময় হঠাৎ ঘুম এসে গেছে, এর মধ্যে লঞ্চটা ঘাটে ভিড়িয়েছে এবং যাত্রী ওঠা নামার পর লঞ্চ ছেড়ে কিছুদূর চলে গেছে। তখন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখি লঞ্চ ছেড়ে অনেকদূর চলে গেছে। তখন আমার কাছে যে কেমন কষ্ট লেগেছিল তা আমিই বুঝি। তখন চিন্তা করলাম এখন বেলা ২ টা। আর মাত্র ২ ঘন্টা যদি স্যুটকেসটা হাতে করে

হাঁটি তবে তো বাড়ী পৌঁছতে বড় জোর ৪টা বাজবে। আর এতটুকু পথের জন্য লঞ্চ ফেল করে যদি আমার কাছে এইরূপ মনে হয় তবে ঐ দ্বীপে যারা জাহাজ ফেল করে তাদের কাছে কেমন মনে হয়। এটা এখন থেকে প্রায় ৫০ বছর পূর্বের কথা। তবুও আমি ভুলিনি কেমন অনুশোচনা আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল শুধু এতটুকুর জন্যে যে কেন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি কি ঘুম ঘুম ভাব মনে হওয়ার সঙ্গে ঘুম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারতাম না। এই অনুশোচনায় যেন বুকটা জ্বলে যাচ্ছিল।

তখন বাড়ীর দিকে হাঁটতে শুরু করলাম আর চিন্তা করতে লাগলাম যে এই এতটুকুর জন্য আমার মনে যদি এইরূপ অস্বস্তি লাগে তাহলে দ্বীপে জাহাজ ফেল করলে তার কাছে কেমন লাগার কথা।

আর এর পর চিন্তা করলাম– বেহেশ্‌ত দেখিয়ে যদি বলা হয় যে এটা তোমার জন্য চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে গেছে আর দোজখ দেখিয়ে যদি বলা হয় এই দোজখেই তোমাকে চিরকাল থাকতে হবে তবে সে অনুশোচনা যে কতগুণ বেশী হবে তা চিন্তা করলেই বোঝা যায়। আমি সেদিন ৫ মাইল পথ হেঁটেছিলাম্ এই চিন্তাই করতে করতে আল্লাহর মেহেঁরবানি বাড়ী পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত সেদিন কোন পথ চলার সাথীও মেলেনি। পরে চিন্তা করলাম আল্লাহ যা করেন তা ভালর জন্যই করেন। যদি সেদিন লঞ্চ ফেল না করতাম তাহলে গোর আজাবের অনুশোচনা যে কত ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক হবে তা অনুভব করতে পারতাম না। এই অনুশোচনার শাস্তিটা কেমন হবে তারই রূপক উদাহরণ দেয়া হয়েছে বিভিন্ন কথায়।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ যা কোন দিন চোখে দেখেনি তা বুঝাতে গেলে মানুষের দেখা কোন জিনিসের উদাহরণ দিয়েই বুঝাতে হয়। এই জন্যই কবরের আজাবের শাস্তি কিরূপ হবে তা হাদিসে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বুঝান হয়েছে।

কবরের আজাব সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালীর এ যুক্তিটা আমার নিকট গ্রহণযোগ্য যুক্তি বলে মনে হয়। কারণ মৃত্যুর পর তার রূহ্ দেহের মধ্যে থাকবে না। আর দেহে যদি রূহ্ না থাকে— তাহলে মরা লাশের উপর বেতের বাড়ি– লোহার গুর্জ ইত্যাদির আঘাত যতই তীব্রতর হোক না কেন তাতে ঐ ব্যক্তির শাস্তি পাওয়ার কথা নয়। তখন থাকে তার দেহবিহীন রূহ্। যে রূহের কোন শরীর নেই। সে রূহের যেটুকু থাকে তা হচ্ছে

দেহবিহীন একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ যার কোন আকার নেই। তাই সেই দেহবিহীন পূর্ণাঙ্গ মানুষটার যে মন থাকবে সে মনের সচেতনতা এখন যেরূপ আছে তখনও সেইরূপই থাকবে। কাজেই তার শাস্তি মনের উপর হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত; দেহের উপর নয়। আর যখন তাকে শাস্তি বা পুরষ্কার দেয়া হবে তখন তো আল্লাহ্ বলেছেন "ওয়া ইজান্ নফুসু জুব্বেজাত" – সূরা তাকবীর (আমপারা) অর্থাৎ তখন মরা পঁচা দেহকে পুনরায় নতুন দেহে পরিণত করে তার সঙ্গে রূহ্কে জুড়ে দেয়া হবে। এটা আল্লাহর কথা। তারপর কেয়ামতের মাঠে হাজির করে বিচার করা হবে। এর পর বিচারের রায় শুনিয়ে দেয়া হবে। তার পরই রায় মুতাবিক যে দোজখে যাওয়ার যোগ্য হবে তাকে দেহ সমেত এই দুনিয়ার একটা জীবন্ত মানুষের ন্যায় রূহ্ দেহের মধ্যে জুড়ে দিয়েই একটা আকার ও চেহারা সুরাত বিশিষ্ট মানুষকেই আগুনে ফেলে দেয়া হবে। যেন তার দেহটা পুড়লে সে শাস্তি পায়। কিন্তু কবরে যখন দেহই থাকবে না তখনকার শাস্তি দেহে হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, তখনকার শাস্তি হতে পারে শুধু মনের উপর। আর মনের অনুশোচনার শাস্তিটাও হবে ভয়াবহ।

আলমে বারযাখ শব্দের অর্থ

আলম অর্থ জগত আর বারযাখ অর্থ যবনিকা বা পর্দা। বারযাখ শব্দটা প্রকৃত ফারসি শব্দ। এটা আরবীতে পর্দার আড়াল বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। বারযাখ শব্দ দিয়ে আল্ কুরআনে সর্বমোট ৩ টি আয়াত আছে। যার ৩টিতেই অদৃশ্য পর্দা বুঝান হয়েছে। যেমন– সূরা-আল মুমেনূনের ১০০ নং আয়াতে বলা হয়েছে

وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ –

অর্থাৎ এখন এই সব (মরে যাওয়া) লোকদের পিছনে একটি বারযাখ বা অদৃশ্য পর্দার আড়াল হয়ে আছে পরবর্তী কিয়ামতের জীবনের দিন পর্যন্ত। অর্থাৎ দুনিয়া ও পরকালের মাঝখানের সময়টাই হচ্ছে অদৃশ্য পর্দার আড়ালের জগত বা আলমে বারযাখ।

অপর বারযাখ শব্দটি এসেছে সূরা আর রাহমানের ২০ নং আয়াতে। সেখানে বলা হয়েছে—

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ۝

অর্থ– উভয় সমুদ্রের মধ্যে এমন একটা অদৃশ্য আড়াল রয়েছে যার কারণে দুই সমুদ্রের দুই প্রকার পানির পথ কখনও সেই অদৃশ্য আড়ালকে অতিক্রম করে না। এখানেও বারযাখ থেকে সেই অদৃশ্য আড়ালকেই বুঝান হয়েছে। আড়াল অথচ কিসের যে আড়াল তা মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। এরই নাম বারযাখ।

আর ৩য় আয়াতটি হচ্ছে সূরা ফোরকানের ৫৩ নং আয়াত। সেখানে বলা হয়েছে–

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ج
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ○

আর তিনি দুই সমুদ্রকে মিলিয়ে রেখেছেন যার একটির পানি মিষ্টি (লবণবিহীন) এবং অপরটির পানি তিক্ত লবণাক্ত। আর এ দুই সমুদ্রের মাঝখানে একটা অদৃশ্য আড়াল বিদ্যমান রয়েছে। একটি প্রতিবন্ধকতা এই দুইটির পানিকে এক সঙ্গে মিশতে বাধা দিচ্ছে।

এর মোটামুটি দু'টি উদাহরণ আমাদের সামনে আছে যার থেকে উক্ত আয়াতের সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। যথা–

১। প্রত্যেকটি বড় নদী সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়েছে কিন্তু নদী ও সমুদ্রের মাঝে এমন এক অদৃশ্য আড়াল রয়েছে যে নদীর সীমানার পানি মিঠে আর সমুদ্রের সীমার পানি লবণাক্ত।

২। বাহরাইন ও অন্যান্য সমুদ্রে যেমন পারস্য উপসাগরেও লবণাক্ত পানির মধ্যে কোন কোন স্থানে মিঠে পানি রয়েছে। বিশেষ করে পারস্য উপসাগরের তলদেশের একটা স্তরে মিঠে পানি রয়েছে যা মানুষ পানীয় পানি হিসেবে সেখান থেকে তুলে এনে ব্যবহার করে। এই দুই ধরনের মধ্যে আল্লাহর গায়েবী কুদরতে এমন এক অদৃশ্য আড়াল বা পর্দা রয়েছে যা ভেদ করে দুই ধরনের পানি একত্রে মিশতে পারে না।

এই যে অদৃশ্য আড়াল এইটার নামই হচ্ছে বারযাখ। ঠিক তেমনই পরকালের দেহবিশিষ্ট জীবন এবং দুনিয়ার দেহ বিশিষ্ট জীবনের মাঝখানে যে অদৃশ্য আড়ালের একটা জগত আছে ঐ জগতটাই হচ্ছে আলমে বারযাখ।

আমরা কি আলমে বারযাখে গিয়ে দেখেছি যে তা কেমন?

হাঁ আল্লাহ আমাদের বার বার দেখিয়েছেন। আমরা ঘুমিয়ে গিয়ে যে স্বপ্ন দেখি তখন দেখি অনেক মৃত লোককে— যারা বহু পূর্বেই স্থায়ী ভাবে আলমে-বারযাখে চলে গিয়েছে। আর আমরা অস্থায়ীভাবে তাদের সঙ্গে দেখা করি কিন্তু যেহেতু আমরা স্থায়ী ভাবে এখনও যাইনি তাই আমাদের আবার আলমে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেন যা আমরা সূরা আল্ মুমেনূনের ১০০ নং আয়াত থেকে কিছুক্ষণ পূর্বেই পড়ে দেখেছি। এর পরও একটা প্রশ্ন থেকে যায় তা হচ্ছে স্থায়ীভাবে যখন যাই তখন তো খুবই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় কিন্তু অস্থায়ীভাবে যখন যাই তখন তো সেই কষ্ট সহ্য করতে হয় না এর কারণ কি? এর কারণ— আল্লাহ বলেছেন সূরা ফুরকানের ৪৬ নং আয়াতে— (যদিও ভিন্ন প্রসঙ্গে তবুও আল্লাহর কথা শুধু একই অর্থ দেয় না; দেয় একাধিক অর্থ, সে কারণেই এ আয়াতটা এখানে আনা হল)

ثم قبضنه إلينا قبضا يسيرا ۝

"পরে তাকে আমার দিকে সহজভাবে কবজ করে বা গুটিয়ে নেই।" এর থেকে মনে হয়, এটাও বলা হয়েছে যে স্থায়ীভাবে জান কবজের পূর্বে যখন অস্থায়ী ভাবে জান কবজ করেন তখন খুব সহজ সরলভাবে জান কবজ করেন। এরপর ঘুমের মধ্যে যেমন কখনও স্বপ্ন দেখে আবার কখনও অজ্ঞান অবস্থায় থাকে ঠিক তেমনই কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত মানুষ কবরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকার মত থাকবে। তবে এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে. মুর্দাকে সালাম দিলে সে সালামের জওয়াব দিয়ে থাকে, এটা কিরূপে হয়? এর জওয়াব এইরূপ হতে পারে যে মৃত্যু আর ঘুম হুবহু এক প্রকার নয়। মানুষ যখন ঘুমায় তখন অচেতন হয়ে ঘুমালেও অনেক সময় এমনও দেখা যায়— যেমন সকালে ঘুমিয়ে আছি, আমি আছি তখন একটা পর্দার আড়ালের জগতে, এমন সময় ফজরের আযান হচ্ছে। আমি স্বপ্নে দেখছি যেন কোথাও কোন অজানা স্থানে আছি, সেখানে মনে হচ্ছে আসরের নামাজের আযান দিচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে যেন আমি আসরের নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, এর মধ্যে হঠাৎ জেগে দেখি যে ফজরের নামাযের আযান হচ্ছে। এতে আমার মনে হয়, আমি যখন একেবারে বেহুঁশ হয়ে ঘুমাচ্ছি তখন দুনিয়ার মসজিদের আযান আমার রূহ শুনতে পায় ঠিক

তেমনই পর্দার আড়ালের জগৎ থেকে দুনিয়ার কোন কোন কথা যা আল্লাহর ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত তা শোনা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন হাদিসের থেকে যা বুঝেছি, প্রকৃত ঘটনাই হচ্ছে এই যে পর্দার আড়ালের জগত থেকে দুনিয়ার কিছু জিনিস প্রথম প্রথম কিছু দিন মৃত ব্যক্তির বাড়ির নিকটে থাকবে এবং তার বাড়ীর লোকদের কথা শুনবে কিন্তু তার কথা কেউ শুনবে না। এর পর তার রূহ হয় মাকামে ইল্লিনে বা মাকামে সিজ্জিনে চলে যাবে। এর পর বদকার রূহকে বেহেশ্‌ত দোজখ দেখানোর পর যখন জানান হবে যে তোমাকে চিরদিন ঐ দোজখে থাকতে হবে তখন স্বপ্নে যেমন– আমাদের পূর্ণ অনুভূতি নিয়েই দেখি ঠিক সেইরূপ বরং তার চাইতেও স্পষ্টভাবে দেখবে, বুঝবে এবং অনুশোচনা করবে। তার সেই দুশ্চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলবে। পরে এক সময় ঐ অস্থিরতার ভিতরেই অচেতন হয়ে পড়বে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অচেতন অবস্থাতেই থাকবে। আর নেককার বেহেশ্‌ত দেখে খুশী হবে এবং সে খুশীর সঙ্গে মায়ের কোলে ঘুমানোর মত ঘুমিয়ে যাবে। এর পর কিয়ামত পর্যন্তকার সময়টা যত দীর্ঘই হোক না কেন ঘুমিয়ে থাকবে। কিয়ামতে উঠার পর মনে হবে যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠলো। এর পর বুঝতে পারবে যে এটা কিয়ামত। সেদিনও যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে 'কাম লাবেস্‌তা?' কত সময় ঘুমিয়ে ছিলে? (যেমন পূর্বেই কুরআনের আয়াত থেকে বলা হয়েছে) তখন মৃত ব্যক্তিগণ জেগে সেইরূপই বলবে– "লাবিস্‌তু ইয়াউমান্ আও বা'জা ইয়াওমিন" অর্থাৎ হয় পুরা একদিন অথবা মাত্র কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে ছিলাম।

শহীদদের জন্যে আলমে বারযাখ

শহীদদের সম্পর্কে আল্লাহ সূরা বাকারার ১৫৪ নং আয়াতে বলছেন–

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۝

"যে আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে বা শহীদ হয়েছে তাকে তোমরা মুর্দা বল না বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা টের পাওনা।"

এরা দেহবিহীন মানুষ। জীবিত অবস্থায়ই তারা থাকে এবং আল্লাহ তাদের আলমে বারযাখের উপযোগী জীবনোপকরণ দিয়ে থাকেন।

অন্যত্র সূরা আলে ইমরানের ১৬৯নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط
بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○ اٰل عمران ١٦٩

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। তারা আল্লাহর নিকট থেকে রিযিক পাচ্ছে।"

আল্ কুরআনের এই আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হল যে যারা শহীদ তারা আমাদের দৃষ্টিতে মুর্দা হলেও আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা জীবিত। এমনও হতে পারে যে তাদেরকে আল্লাহ এমন অদৃশ্য দেহ দিয়েছেন যা আমরা চোখে দেখতে পাই না, এমন বহু জীবিত জীব রয়েছে যাদেরকে আমরা দেখতে পাই না। যেমন ধরুন ফেরেশ্তাগণ জীবিত, তাঁরা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কিন্তু তাদের আমরা দেখতে পাইনা। আবার বহু জিন আছে— যাদের সংখ্যা কম নয়— তারা জীবিত এবং তারা খেয়েই বাঁচে। আর তারা বাঁচে বহুদিন পর্যন্ত। হয়ত এমনও হতে পারে যে এসব শহীদগণ ঐভাবেই বেঁচে থাকবেন যেমন জিনেরা বেঁচে রয়েছে। তারা হয়ত আমাদেরকে দেখবে কিন্তু আমরা তাদের দেখতে পাবো না।

এ প্রসঙ্গে আমার একটা স্বপ্নের কথা বলছি। আমার বড় নাতি ছেলে অর্থাৎ বড় মেয়ের বড় ছেলে প্রায় মাস খানেক পূর্বেই শহীদ হয়ে যায়। তার বয়স ছিল ২৩ বছর। নাম হাসানুজ্জামান। তার আব্বা শহীদ হয় ৭১ এর যুদ্ধে। এর পরে এ ছেলে ফাজিল পাস করে কামিলে পড়ছিল। হঠাৎ একদিন ঢাকা থেকে ফোনে খবর পেলাম সে যশোরে শহীদ হয়ে গেছে। ফোন পেয়ে যারা সুস্থ ছিল তারা সবাই তখনই যশোর চলে গেল কিন্তু অসুস্থতার কারণে আমি যেতে পারলাম না। রাত্রি ১টার দিকে তাকে দাফন করা হয়। আমি ঐ রাত্রি ১টার দিকেই ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখছি যে হাসান সোনালি রংয়ের একটা ঘরের মধ্যে রয়েছে। হাসানের গায়ের রংও দেখলাম সোনালী রং এর। আমাকে সে বলল নানা, আমি মরিনি তবে কিছু সময় বেহুঁশ ছিলাম। আমাকে বলল, "আমি একটা বিকট আওয়াজ শুনলাম, তারপর কিছুক্ষণের খবর রাখি না পরে হুঁশ হওয়ার পর দেখি আমাকে ঘরে এনে রেখেছে। এটা বড় আরামের ঘর। এত আরাম আমি কখনও অনুভব করি নি, ... ইত্যাদি অনেক কিছু দেখলাম। তারপর কুরআনের কথার সঙ্গে আমার স্বপ্নকে মিলিয়ে দেখলাম। আল্লাহর কথার

সঙ্গে আমার স্বপ্ন হুবহু মিলে গেল। এরপরও একটানা ৮/৯ দিন পর্যন্ত তার সম্পর্কে এমন সব কিছু অস্পষ্ট তথ্য জানতে পারি যা নিজেই অনুভব করছি যা বলা যাবে না কাউকে। এতে আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পেরেছি যে যারা শহীদ হয় তারা আল্লাহর কথা মুতাবিক সত্যই জিন্দা এবং থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ করেন। হয়ত এভাবেই তারা কিয়ামত পর্যন্ত চির যৌবনকাল নিয়ে বেঁচে থাকবে। তারপর এমনও হতে পারে যে তাদের কাছে এই দীর্ঘ সময়টাও খুব কম মনে হতে পারে।

কুরআন ও হাদীসের সব কথা মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মৃত্যুর পর অদৃশ্য আড়ালের জগতটা হয়ত সবার জন্য এক প্রকার হবে না।

(১) কারো জন্য সময়টা এত কম হবে যতটুকু সময় লাগে মাত্র দুই রাকআত নামায পড়তে।

(২) হয়ত কারো জন্য পরবর্তী আড়ালের জীবনটা কিয়ামত পর্যন্ত সময় এত খাট হবে যে একটা ১০০ দানার তাসবীহ একবার পড়ারও সময় পাবে না তার মধ্যে কিয়ামত হয়ে যাবে। এদের কাছে মুনকির নাকির কোন প্রশ্ন করারও সময় পাবে না।

(৩) কেউ ঘুমিয়ে থাকার মত ঘুমিয়ে থাকবে। আর মাঝে স্বপ্নের মত কিছু দেখবে। আবার ঘুমিয়ে যাবে। তবে তাদের নিকটও সময়টা বড় জোর কয়েক ঘণ্টার মত মনে হবে।

(৪) আর কারো জন্য সময়টা বড়ও হতে পারে– যারা বদকার লোক।

(৫) কারো সময়টা খুবই মনোকষ্টের মধ্যে কাটবে। এ জন্য সময়টা দীর্ঘ মনে হবে।

কয়েকটি হাদীস

এক. রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির রূহ্ বের হওয়ার তিন দিন পরে রূহ্ বলে, হে আমার রব! আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি যে শরীরে ছিলাম সে শরীরটাকে একটু দেখে আসি। আল্লাহ অনুমতি দিবেন। তখন সে রূহ্ তার কবরের নিকট গিয়ে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে শরীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে। দেখতে পাবে যে শরীরের নাক ও মুখ দিয়ে পানি বয়ে যাচ্ছে। ইহা দেখে সে অনেক্ষণ পর্যন্ত অনুতাপ ও ক্রন্দন করতে থাকবে।

অতঃপর বলবে, "হে আমার আশ্রয়হীন শরীর! হে আমার বন্ধু! জীবনকাল কি তোমার স্মরণ হচ্ছে? এই কবর কিন্তু ভয়, মুসিবত, চিন্তা, দুঃখকষ্ট এবং লজ্জিত হওয়ার স্থান।" এই কথা বলে রূহ্ চলে যাবে।

অতঃপর পাঁচ দিন অতিবাহিত হলে রূহ্ আবার বলবে হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আর একবার অনুমতি দিন। আমি আমার শরীরটাকে পুণরায় দেখে আসি। আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দিবেন। তখন রূহ্ কবরের কাছে আসবে এবং দূর থেকে শরীরের দিকে তাকাবে। তখন দেখতে পাবে, নাকের ছিদ্র ও মুখ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। কান দিয়ে পুঁজ ও হলুদ পানি বের হচ্ছে। তখন সে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাঁদতে থাকবে এবং বলবে "হে আমার আশ্রয়হীন শরীর! তোমার সেই জীবন কালের কথা স্মরণ আছে কি? এই কবর কিন্তু চিন্তা, দুঃখকষ্ট, পোকামাকড় ও সাপ বিচ্ছুর স্থান। কীট পোকারা তোমার মাংস ও শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবকিছু খেয়ে ফেলবে।" অতঃপর সে চলে যাবে।

যখন সাত দিন অতিবাহিত হয়ে যায় তখন রূহ্ আবার আল্লাহর দরবারে অনুমতি চেয়ে বলে হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আরও একবার অনুমতি দিন যাতে আমি আমার শরীরটাকে আবারও দেখে আসতে পারি। আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দিলে রূহ্ কবরের কিছু দূরে থেকে শরীরের দিকে দৃষ্টি করতে থাকবে। তখন দেখতে পাবে যে, শরীরের উপর পোকা পড়েছে। রূহ্ ইহা দেখে খুবই কাঁদতে থাকবে। আর বলবে হে আমার শরীর! তোমার কি সেই জীবনকাল মনে আছে? তোমার সন্তানাদি, আত্মীয় স্বজন, গোত্রের লোকেরা কোথায়? কোথায় তোমার ঘরবাড়ী, কোথায় তোমার ভাইবোন, বন্ধু বান্ধব ও সেই প্রতিবেশী যারা তোমার প্রতিবেশীত্বে সন্তুষ্ট ছিল? তারা সবাই আজ তোমার বিরহ বেদনায় কাঁদছে।

দুই. হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) হতে বর্ণিত আছে, মু'মিন বান্দা যখন মরে যায়, তখন তার রূহ্ একমাস পর্যন্ত তার বাড়ীর চারদিকে ঘুরতে থাকে। আর দেখতে থাকে যে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি কিভাবে বণ্টন করা হচ্ছে। কিভাবে তার কর্জ পরিশোধ করা হচ্ছে। যখন একমাস পূর্ণ হয়ে যায় তখন সে কবরের দিকে ফিরে যায়। এক বৎসর পর্যন্ত সে কবরের চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে এবং দেখতে থাকে যে কে তার জন্য দোয়া করতেছে। কে তার জন্য চিন্তা করতেছে। বছর যখন শেষ হয় তখন তার রূহ্কে সকল রূহ্ যেখানে রয়েছে সেখানে পৌঁছে দেয়া হয় এবং সিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সময় পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে।

তিন. রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সে পবিত্র সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রেখে দাফন কার্য শেষ করে লোকজন চলে আসে, তখন সে মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। মৃত ব্যক্তি যদি মু'মিন হয়, তখন নামায তার শিয়রে এসে দাঁড়ায় এবং রোযা তার

ডানপাশে, যাকাত তার বাম পাশে এবং কৃত নফল আমল যেমন– সাদকা, নফল নামায এবং মানুষের প্রতি কল্যাণ ও সদ্ব্যবহার ইত্যাদি আমলসমূহ পায়ের দিকে এসে দাঁড়ায়। মুমিন ব্যক্তির শিয়রের দিক থেকে আযাব আসলে তখন নামায তার বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ডান দিক থেকে আযাব আসলে রোজা সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর বাম দিক থেকে আযাব আসতে থাকলে যাকাত সে আযাব আসতে বাধা দেয়। পায়ের দিক থেকে আযাব আসলে সাদকা ও জনকল্যাণমূলক কাজগুলো আযাব আসার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। – (আত্ তারগীব)

চার. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) এর এক সাহাবী একটি কবরের উপর তাঁবু খাটালেন। তাঁর জানা ছিল না যে, একটি কবর। তাঁবুতে বসে তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন যে, এর মধ্যে এক ব্যক্তি সূরা "তাবারাকাল্লাযী বি ইয়াদিহিল মুল্ক" পড়তেছেন এবং পুরো সূরাটা তিনি পড়লেন। এ ঘটনা সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, এ সূরা (কবরের) আযাব দূর করেছে এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচিয়েছে। (মিশকাত)

পাঁচ. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, নিশ্চয় কুরআন মজীদে ত্রিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা আছে। সে সূরাটির সুপারিশে এক ব্যক্তিকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি (স) বললেন, সে সূরাটি হল "তাবারাকাল্লাযী বি ইয়াদিহিল মুল্ক।" (মিশকাত)

ছয়. হযরত সুলাইমান ইবনে সবরদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে লোক পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করে তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হয় না। (আহমদ, তিরমিযী)

সাত. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে মুসলমান ব্যক্তির জুমুআর দিনে অথবা রাতে মৃত্যু হয়, তাকে আল্লাহ তায়ালা কবরের বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। (আহমদ, তিরমিযী)

আট. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, রমযান মাসে মৃত ব্যক্তি থেকে কবর আযাব উঠিয়ে নেয়া নিশ্চিত। (বায়হাকী)

খন্দকার আবুল খায়ের রচিত কয়েকটি হৃদয়গ্রাহী বই

		হাদিয়া
দারসুল কুরআন– ১ম খন্ড	খন্দকার আবুল খায়ের	৮০.০০
সওয়াল জওয়াব– ১ম খন্ড	”	৯০.০০
বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান	”	২০.০০
কালেমার হাকীকত	”	৩৫.০০
অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক	”	২০.০০
স্মারক পত্র	”	৬.০০
বাংলাদেশে দ্বীন ইসলাম মুকীম না মুসাফির	”	৬.০০
সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা	”	২০.০০
আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য	”	১০.০০
দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা	”	২০.০০
প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী	”	১৫.০০
কুরবানীর শিক্ষা	”	১০.০০
ঈমানের দাবী ও মু'মিনের পরিচয়	”	২৫.০০
কেসাস অসিয়াত রোযা	”	১২.০০
অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা	”	১৫.০০
ইসলামী দন্ডবিধি	”	১২.০০
মিরাজের তাৎপর্য	”	২০.০০
পর্দার গুরুত্ব	”	২০.০০
বান্দার হক (হুককুল ইবাদ)	”	২০.০০
ইসলামী জীবন দর্শন	”	২০.০০
মহাশূন্যে সবই ঘুরছে	”	২৫.০০
নাজাতের সঠিক পথ	”	২০.০০
ইসলামে রাজদন্ড	”	১২.০০
যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব	”	৬০.০০
রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিদায়ী ভাষণ	”	২০.০০
সূরা ইখলাসের হাকীকত	”	১৫.০০

স্ক্যানিং পি ডি এফ ও সম্পাদনা:-
আব্দুল মালিক তালুকদার
তারিখঃ-০৭/১০/২০১৪

আরও ই-বোক সংগ্রহের জন্য,ভিজিট করুন।
http://quransunnahralo.wordpress.com
http://iqraqitab.blogspot.com

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা